প্রথম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।। বৈশাখ ।। ১৩৮২

আনন্দমেলা

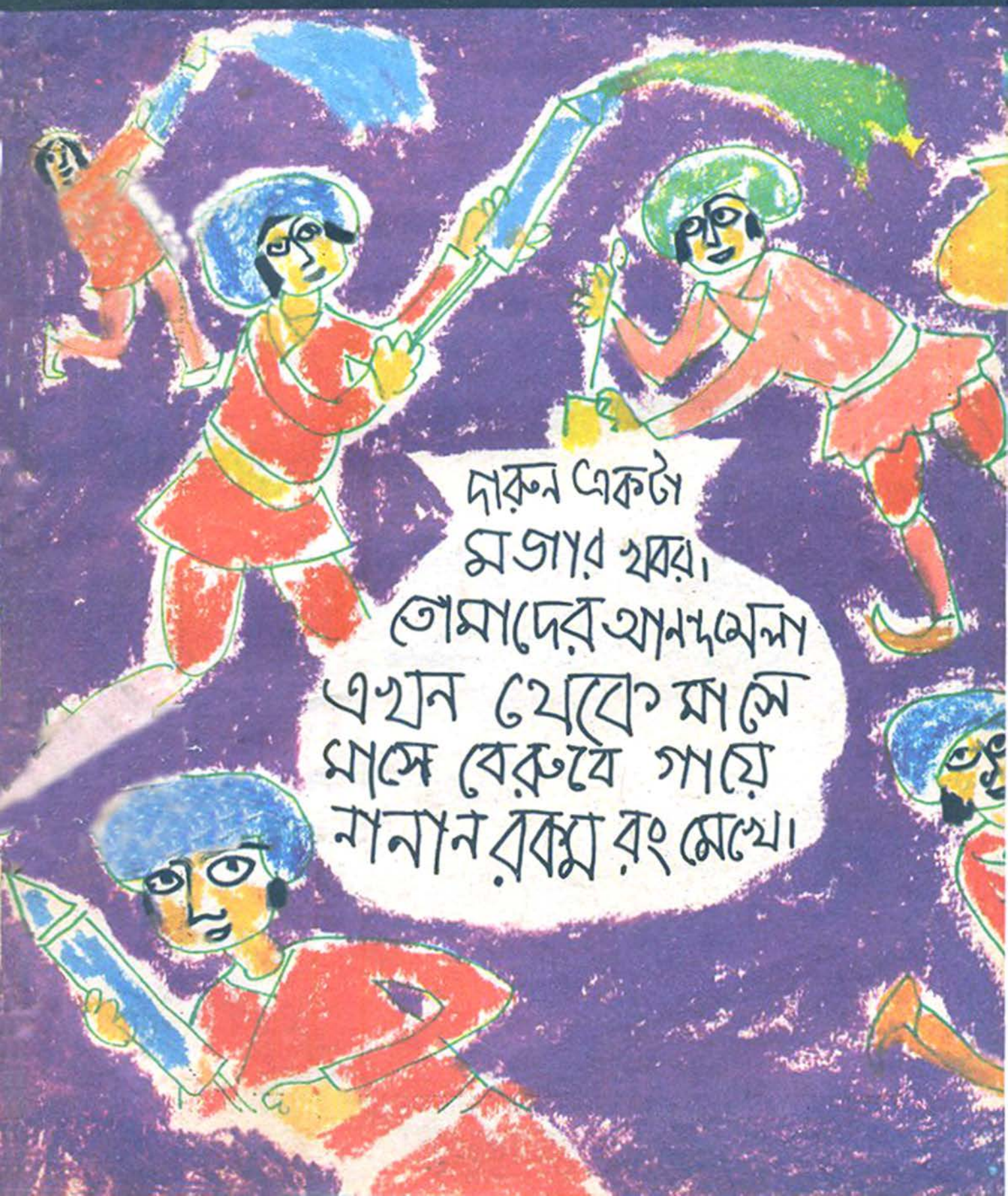

আনন্দমেলা এতদিনে তোমরা নিজেদের হাতে পেলে। এখন আর শুধু বড়দের কাগজের এক কোণায় তোমাদের উঁকিঝুঁকি দিতে হবে না, বরং বড়রাই হয়তো তোমাদের কাগজ নিয়ে টানা-টানি করবেন। কারণ এর সামনের মলাট থেকে পিছনের মলাট অবধি সবটুকুই যে মজার মজার ছড়ায় গল্পে মজাদার রঙ-বেরঙের ছবিতে টইটম্বুর! অথচ তারই ফাঁকে কত কি জানাও যাবে। পৃথিবীতে কত কি জানবার আছে, মাসে মাসে তোমরা পড়ে গেলেই একদিন কেউ না কেউ অবাক হয়ে ভাববে, তোমরা এত সব জানলে কি করে। সেই কথা মনে রেখেই আনন্দমেলাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোমাদের হাতে দেবার চেষ্টা করেছি আমরা। যে-সব নামকরা লেখক তোমাদের কথা ভাবেন, যাঁদের লেখা তোমাদের ভাল লাগে, তাঁদের সকলকেই আমরা আনন্দ-মেলায় ডাক দিচ্ছি। কিন্তু তোমরাও পিছিয়ে থেকো না। ছড়ায় ছবিতে গল্পে যে যে-ভাবে পারো মেলা জমজমাট করে তোলো।

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ।। ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া
অবাক চা পান । পিপীলিকার ভ্রমণ কাহিনী । অন্নদাশঙ্কর রায় ২
হাসির গল্প
বিষে বিষক্ষয় । আশাপূর্ণা দেবী ৬
মজার গল্প
সুন্দরী । লীলা মজুমদার ৫২
ভূতের গল্প
রাত গভীর । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৮
গ্রীম ভাইদের গল্প
মাস্টার ফ্রিয়েম । কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৮
ইতিহাসের গল্প
শেষ দান । অসিত গুপ্ত ২২
উপন্যাস
কাপালিকরা এখনও আছে । বিমল কর ১২
রাজা হওয়ার ঝকমারি । বিমল মিত্র ৩৬
কমিক্‌স্‌
কাঁকড়া রহস্য । টিনটিন ২৬
ওদের চোখে মোদের ভারত
প্রথম দূত এল আলেকজাণ্ডারের দেশ থেকে । পূর্ণেন্দু পত্রী ৩২
জীবনী
জোন অব আর্ক । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪০
বিজ্ঞান
পিঁপড়ের আতিথেয়তা । সমরজিৎ কর ৪২
আমরা রামধনু কেন দেখি । বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ৪৫
নিয়মিত বিভাগ
জাদুঘর । শ্রীপান্থ ১১
ম্যাজিক । যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র ২১
ম্যাজিকের মত । পার্থসারথি চক্রবর্তী ৩৪
রাজায় রাজায় । হিমানীশ গোস্বামী ৩৫
বিন্দু বিসর্গ । ইন্দ্রমিত্র ৪২
আজব চিড়িয়াখানা । বহুরূপী ৪৪
জানা না জানা । সবজান্তা ১০ ১৭ ৫৪
মনিমেলার খবর ৫১
? । এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৫০
খেলা
হকি খেলার জন্মকথা । মুকুল ৪৮
ধাঁধার পাতা । সত্যসন্ধ ৫৪

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক ।। অশোককুমার সরকার

তোমরা তো সোনার কেল্লা ছবি দেখেছো। সেই রঙচঙে টাইটেলের ছবিগুলো নিশ্চয় এখনো তোমাদের চোখে ভাসছে। তারই থেকে দুটো ছবি নিয়ে আমরা এবারের সামনের ও পিছনের মলাটে ছাপলাম। ছবি দুটো কার আঁকা জান তো। কার আবার! সত্যজিৎ রায়েরই।

ছড়া ও

অন্নদাশংকর রায়

অবাক চা পান

এক যে ছিল হাবু।
তার যে ছিল ভাইটি, ওর
নামটি ছিল লাবু।
বাবার যিনি বাবা তাঁকে
ডাকত বাবাবাবু।
বিকেলবেলা নিত্য
চায়ের আসর জাঁকিয়ে বসা
বাবাবাবুর কৃত্য।
জুটত পাড়ার ছেলেবুড়ো
মনিব আর ভৃত্য।
গণতন্ত্র খাঁটি
কারো হাতে মাটির খুরি
কারো পাথরবাটি।
কারো হাতে পেয়ালা আর
পিরিচ পরিপাটি।
কেই বা থাকে বাকী?
কুত্তাও খায় চেটে পুটে
বিল্লীও চা-খাকী।
দাঁড়ে বাঁধা বুড়ো তোতা
সেও চা-খোর পাখী।
হাবু আর লাবু
জ্বর হলেও খাবে নাকো
বার্লি আর সাবু।
তাদের জন্যে চা বানাবেন
বাবার যিনি বাবু।
বিদ্যে তো লাস্ট কেলাস
চায়ের জন্যে তাদের কিনা
এনামেলের গেলাস।
বন্ধু যারা আসত তারা
গেলাস দেখেই জেলাস।
পাশের বাড়ীর খুড়ো
আফিং খেয়ে নেশার ঘোরে
আসতেন সেই বুড়ো।
তাঁর হাতে এক কাঁচের গেলাস
আধসেরটাক পুরো।
ক' রে, তোরা ক'

শুধান তিনি, বর্ণমালায়
ক'টা আছে স।
তিনটে আছে, দু' ভাই বলে
শ. ষ. স।
উঁহু! উঁহু! উঁহু!
তাকান তিনি মিটিমিটি
হাসেন মুহু মুহু।
বিদ্যেসাগর পড়িস্ বুঝি!
হা হা! হি হি! হু হু।
ক' রে, তোরা ক'
বানান করে গোটা গোটা
গে...লা...স...
ইংরিজীটা শিখলে পরে
চারটে হবে স!

পিপীলিকার ভ্রমণ কাহিনী

পিঁপড়ে গেলেন বৃন্দাবন
পিঁপড়ে গেলেন কাশী
পিঁপড়ে গেলেন হরিদ্বার
প্রয়াগ আর ঝাঁসী।
ঘরের ছেলে এলেন ঘরে
হলেন গৃহবাসী।
তখন তাঁকে ঘিরে ধরে
পিপীলা বাহিনী
ঘরকুণোরা শুনতে চায়
ভ্রমণকাহিনী।
বলেন তিনি, "যেখানে যাই
চিনি কেবল চিনি।"
একমাত্র ঠাকুরমা-ই
বুঝলেন এর মানে
পিঁপড়ে ছিল বন্দী হয়ে
কৌটোর মাঝখানে।
কৌটো ছিল পেড়ীর মধ্যে
একান্ত সাবধানে।
চায়ের সময় খোলা হতো
চায়ের পরেই বন্ধ
চিনির তলায় কে যে আছে
কেউ করে না সন্দ।
পিঁপড়ে থাকে সমস্তক্ষণ
চিনির রসে অন্ধ।

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

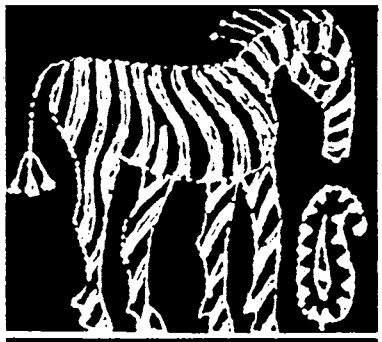

হাসির গল্প

বিষে বিষক্ষয়

আশাপূর্ণা দেবী

কিসে থেকে যে কি হয়।

একথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল জগদীশ উকিলের মতন একজন সভ্য, শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি এমন ভয়ংকর একটা কাজ করে বসতে পারেন। অথচ করলেনও তাই। করালী কবরেজের টিয়াপাখীর মত টিক্‌টিকে নাকটায় হঠাৎ খ্যাঁক্‌ করে এক কামড় বসিয়ে দিলেন জগদীশ।

অপরাধের মধ্যে করালী কবরেজ বলেছিলেন, 'ব্যাধিটি আপনার সামান্য নয় জগদীশবাবু, আমাদের আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে এরে কয় 'অনিদ্রা ব্যাধি।'

ব্যস! বলতে যা দেরী!

হাতের নস্যি হাতেই থাকল, করালীর নাকে আর গুঁজতে হল না। তার আগেই নাকের আগা জগদীশের দাঁতের তলায়।

বহু চেষ্টায় আর বহুজনের হস্ত-ক্ষেপে নাকটা এ যাত্রা উদ্ধার হল বটে করালীর, তবে পরে কি হবে কে জানে। আর এরপর জগদীশের কপালেও কি আছে কে জানে। নাকে রুমাল চেপে শাসিয়ে গেছেন করালী, 'আচ্ছা আমিও কবুরেজের পোলা! দেখি নিমু তোমারে! উকিল আছ ত মাথা কিনছও। লোকের নাক খাইবা? বিশ্ব বহ্মাণ্ডে আর খাইদ্য বস্তু নাই?'

কিন্তু জগদীশ এক ফোঁটাও ভয় খান না, বরং আগের থেকে গলা চড়িয়েই বলেন, 'যা বুড়ো, কি করবি করগে যা। তোর মতন কবরেজকে যে ডেকেছি, এই ঢের! বেয়াল্লিশ দিন পরে তুই আমায় রোগ চেনাতে এসেছিস? আমি জানি না এ ব্যাধিরে কী কয়।'

অথচ করালী জগদীশের দাবার আড্ডার বন্ধু।

তা জগদীশকেও দোষ দেওয়া যায় না, গুণে গুণে বেয়াল্লিশটি রাত ঘুম নেই জগদীশের। তার মানে পুরো একটি মাসের ওপর আরো বারো বারোটা দিন। শুধু ঘড়ির দিকে কটমট করে তাকিয়ে তাকিয়ে রাত কাটাচ্ছেন জগদীশ একটির পর একটি।

চিকিৎসার আর কিছু বাকি নেই। অ্যালোপ্যাথিতে হার মেনে হোমিও-প্যাথি করেছেন, হোমিওপ্যাথিতে ভরসা ছেড়ে টোট্‌কা করেছেন, সুষনী শাকের ঝোল খেয়েছেন, থানকুনির পাতা বেটে গায়ে প্রলেপ দিয়েছেন, হুঁকোর জল মাথায় থাবড়েছেন, রাতে শোবার সময় গরমজলে পা আর বরফ-জলে কান ধুয়েছেন, বিছানায় শুয়ে শত শত বার এক থেকে একশো গুনেছেন, মাঝরাত্তিরে ডন বৈঠক করেছেন, নাকের মধ্যে শিশি শিশি সরষের তেল ঢেলেছেন, কিছুতেই কিছু না।...

এতেও যদি মানুষ খোঁক না হয়ে ওঠে তো আর কিসে হবে? কবিরাজি

চিকিৎসা দুচক্ষে দেখতে পারেন না, তাও করাতে গেলেন, পরিণাম ওই।

খোঁকিত্ব বেড়েই গেল আরো।

সকাল থেকে বিকেল সারাবাড়ি তচনচ্‌ করে বেড়াচ্ছেন জগদীশ, একে বকছেন, ওকে ধমকাচ্ছেন, এটা ছুঁড়ে ফেলছেন, ওটা টান মেরে দূর করে দিচ্ছেন, খেতে নাইতে ডাকলে মারতে আসছেন, সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা!

বাড়ির সবাই তটস্থ। কথাটি কইতে সাহস নেই কারুর। তবু আড়ালে টাড়ালে কেউ কিছু বললে, জগদীশ-জননী নন্দরানী কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'আহা, তোমরা কেউ কিছু বোলো না ওকে। দেখছ না কি ছেলের কি হাল হয়েছে! জগুর আমার নাকের ডাকে গগন ফাটে, মায়ের কোলে ছেলে চমকায়, আচমকা কানে এলে ভয় হয় ধারে কাছে বাঘ গজরাচ্ছে, সেই নাক আজ মাসাধিককাল নিথর নিঃশব্দ। মায়া হয় না তোমাদের?'

বললে কি হবে! মাকেই কি ধমকাতে ছাড়ছেন জগদীশ?

এইতো আজই, যেমন না তিনি ওদের টোস্টে মাখানো মাখন টোস্ট থেকে চেঁছে পুছে তুলে নিয়ে একড্যালা করে চট করে এসে ছেলের মাথার তালুটিতে বুলিয়ে দিয়েছেন, ব্যস্‌! আর যায় কোথা। যেন বিছে কামড়ালো ছেলেকে।

চীৎকার করে উঠলেন ছেলে, 'আবার মাখন? চুলগুলো বিলকুল উঠে যাওয়া ছাড়া মাখনে আর কিছু লাভ হচ্ছে?'

ছেলের মূর্তি দেখে মা তো দে ছুট্‌।

চুলগুলো দাঁড়ানো আলপিনের মত খাড়া, চোখ দুটো পাকা-টোম্যাটোর মত টকটকে লাল, গলার শির তোলা, রগের শির ফোলা। চেঁচাচ্ছেন।

আর চেঁচিয়েই চলেছেন হরদম।

'এখানে এটা কিসের জন্যে? পায়ের কাছে পাপোষ পড়ে কেন?... মাথার ওপর ফ্যান ঘুরে যাচ্ছে কার দরকারে?...রেডিওটাকে গাঁক গাঁক করে খুলে না রাখলে গান শোনা যায় না?

...চায়ে এত চিনি চালানো হচ্ছে, মানে কি?' ইত্যাদি প্রভৃতি।

এমন কি রাস্তায় গোলমাল হলে, ছাতে কাক ডাকলে, কি পাশের বাড়ির ঝি তাদের বামুন ঠাকুরের সঙ্গে চেঁচিয়ে ঝগড়া করলেও জগদীশ পা ঠুকে ঘুসি পাকিয়ে চীৎকার করেন, 'ভেবেছে কি সব? ভেবেছে কি? দেশে আইন নেই? কোর্টটা একবার খুলুক না, একধার থেকে সব ক'টার নামে কেস ঠুকে দেব। ...কোথায় সব? দেখি একবার।'

কেউ সাড়া দেয় না।

সাড়া দিলেই তো ডবল তাড়া খেতে হবে।

তা সাড়া সেও দেয় না, সারারাত ধরে জগদীশ যাকে চড়া গলায় গালমন্দ করে ডাকাডাকি করেন। রাত বারোটা বাজলেই জগদীশের গলার আওয়াজ সারা বাড়িতে গমগমিয়ে ওঠে, 'ওরে ব্যাটা ঘুম! ঘুমের ছানা ঘুম পাষণ্ড শয়তান পাজী বদমাস! কোথায় গিয়ে বসে আছিস? বলি টিকিটি পর্যন্ত আর দেখাচ্ছিস না, এর মানে কি? মরে তো যাসনি! বিশ্বসুদ্ধু সবাইয়ের ঘরেই তো ডিউটি দিচ্ছিস, আমার কাছেই যত ফাঁকি? আমি তোর পূর্বজন্মের শত্রু? জানিস ডিউটি ফাঁকি দেওয়া একটা গুরুতর অপরাধ! আচ্ছা...আমিও দেখে নেব তোকে।'

কিন্তু শেষ রাত্তিরের দিকে সুরটা একটু পাল্টায়, তখন করুণ গলায় বলতে থাকেন, 'ও বাবা ঘুম, আমার নয়ন মানিক, চোখের মণি, একটিবারের জন্যে আয় বাবা! তোকে মোটা টাকা বখশীস দেব 'যা চাইবি তাই দেব—'

কিন্তু কোথায় সেই নির্লোভ নিষ্ঠুর ঘুমের ছানা ঘুমটি! নো পাত্তা!

সকাল হতেই আবার হতাশ গলায় তেজ আসে, আবার জগদীশ বাড়ির লোককে তুলো ধোনেন, ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করেন, ধরে ধরে ধোপার কাপড়ের মত আছাড় মারেন।...না না, বেশী ভয় খেয়ো না, এসবই করেন বটে, তবে সত্যি হাতে পায়ে নয়, শুধু কথা দিয়ে।

কিন্তু কথার ধারই কি কম?
কথার জ্বালাই কি সোজা?
তবু এতদিন পর্যন্ত এতটা হয়নি।
সত্যিকার কামড়!
হ্যাঁ, কাল না পর্শু কবে যেন

ছোকরা চাকর স্বপন কুমারকে কামড়াতে গিয়েছিলেন, তবে সত্যি কামড়াননি। এমনিতে জগদীশ ছোকরাকে খুব নেক নজরেই দেখতেন। ওই যে ছেলেটা সব সময় ফিটফাট ছিমছাম থাকে, কথা কয় সুরেলা গলায়, আর নাম জিগ্যেস করলে পুরো করে বলে 'স্বপনকুমার'—এটা বেশ পছন্দই করেন জগদীশ, কিন্তু কাল না পর্শু হয়ে গেল একখানা। দোষের মধ্যে জগদীশ যখন ওকে সিগারেট আনতে দিচ্ছিলেন, তখন ও বলে ফেলেছিল, 'বেশী সিগ্রেট খাবেন না বাবু! একে আপনার এই নিসুপ্তি অবস্থা—'

'নিসুপ্তি! নিসুপ্তি মানে?

তেড়ে এসেছিলেন জগদীশ, 'বল মানে?' প্রায় কামড়ানোর ভঙ্গীতে।

স্বপন প্রায় কেঁদে ফেলে স্বীকার করেছিল মানে জানে না।

'তবে বললি যে—'

'আজ্ঞে আমাদের গেরামে ঘুম না হলে তো ওই কথাই বলে—' বলে পিট-টান দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল স্বপন-কুমার।

কিন্তু করালী কবরেজ পারলেন না নাক বাঁচাতে। নাকটা খেঁদো হয়ে গেল।

যাবেই। সেই টিয়াপাখিটি কি আর থাকবে?

আজ নন্দরানী ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন, আর তারপর যখন 'কাঠ' থেকে মানুষ হলেন, তাড়াতাড়ি গুরুদেবকে চলে আসবার জন্যে চিঠি লিখলেন।

বিপদ যখন প্রবল হয়, তখন গুরুই ভরসা!

কিন্তু এ বিপদের কারণ কি?

কেন জগদীশের এ দুরবস্থা?

এ ব্যাধির মূল কোথায়?

তা তাহলে বলতে হয়, মূলে জগদীশের সেই ভুনিপিসি।

হ্যাঁ, ভুনি পিসিই।

আজ থেকে বেয়াল্লিশ দিন আগে যিনি কালীঘাটে যাওয়ার পথে দু'ঘণ্টার জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু তাতে কি? দু' ঘণ্টাই কি কম? আর আসল কাজটি সমাধা করতে তো দু মিনিটও লাগেনি। ভাইপোকে কাছে ডেকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহঝরা গলায় বলে-ছিলেন, 'তোর চেয়ারাটা তো ভাল দেখছিনে জগু! শরীর ভাল আছে তো?'

'খুব!'

'খিদে তেষ্টা হয়?'

'দারুণ।'

'রাতে ঘুম ভাল হয়?'

'সাংঘাতিক।'

'যাক্ তাহলেই মঙ্গল। তবে একটি বিষয় সাবধান করে দিই বাছা, রাতে ঘুমুতে গিয়ে কখনো কালো বেড়ালের কথা ভাবিসনে।'

জগদীশ আকাশ থেকে পড়েছিলেন, 'কালো বেড়াল? খামোকা কালো বেড়ালের কথা ভাবতে যাবো কেন?'

ভুনি পিসি দার্শনিকের গলায় বলেছিলেন 'কেন' কথার কি মানে আছে বাবা? ভাবনার কোন খেই পাবে তুমি? বালিশে মাথা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তো তোমার মাথার মধ্যে নাগর-দোলা ঘুরবে। কোথাকার কথা কোথায় চড়বে।...জগতে যত আবোল তাবোল কথা আছে, যত রাজ্যের চেনা অচেনা, না-চেনা নাম-না-জানা সব মানুষেরা এসে উঁকি মেরে মেরে যাবে। জানিনে আমি? তাই বলে রাখছি। কালো বেড়ালের চিন্তাটি বড় খারাপ। ওতে দেহ নষ্ট, মন নষ্ট।'

বোকা সোকা ভুনি পিসিকে জগদীশ চিরকালই একটু ক্ষ্যামা ঘেন্নার সঙ্গে ভালবাসেন, তাই আর ওঁর কথায় বাদ প্রতিবাদ করলেন না, শুধু মনে মনে হাসলেন।

'আমার যেন আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই বিছানায় শুয়ে কালো বেড়ালের ধ্যান করতে বসব। এত অদ্ভুত কথাও বলতে পারেন ভুনি পিসি!'

কিন্তু কে জানত, জগদীশের 'সকল অহঙ্কার ঘুচিবে চোখের জলে'!

ঠিক সেই রাত্তিরেই, বিছানায় শোওয়া মাত্রই সেই ঘটনাটি ঘটল।... জগদীশের চোখের সামনে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট নিকষ পালিশ কালো বেড়ালের চেহারা ভেসে উঠল।

সেরেছে! এটা আবার কী? সত্যি কোনো বেড়াল-টেড়াল আসেনি তো? জগদীশ অবাক হয়ে উঠে বসলেন, এদিক সেদিক তাকালেন; কই কোথাও তো কিছু না।

জল খেয়ে, চোখে জল দিয়ে ফের শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আবার সেই!

'ভাল বিপদ হল তো!'

মনে মনে বললেন জগদীশ, 'কি মুস্কিল! জোর করে তাড়াতে চেষ্টা করলেন সেই দৃশ্য, কিন্তু আবার, আবার সেই কামান গর্জন!'

জগদীশ উঠে পড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, আকাশভরা চন্দ্রতারা দেখলেন ভগবানের নাম (রোজ তেমন না করলেও আজ) করলেন, আবার এসে বালিশ উল্টে শুলেন।

কিন্তু কি অদ্ভুত আশ্চর্য কাণ্ড!

আবার সেই!

মনের রাস্তার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। আস্তে আস্তে লেজটি বাঁকিয়ে।

জগদীশ কলঘরে গিয়ে মাথা ধুলেন, অনেকক্ষণ ধরে পায়ে জল ঢাললেন, ফ্যানটাকে জোর করে দিলেন, তারপর শুয়ে পড়ে চোখ বুজে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন, 'চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই—'। এই একটা মাত্রই গান জানেন জগদীশ, ছেলেবেলায় ব্রতচারীতে শিখেছিলেন।

জগদীশ বিয়ে-ফিয়ে করেননি, কাজেই গান শুনে ঘরের মধ্যে কেউ হেসে উঠল না, জগদীশ আস্তে আস্তে গলাকে একটু চড়ালেন, 'ছেড়ে অলস মেজাজ হবে শরীর ঝালাই! যত ব্যাধির বালাই, করবে—' যাক বাবা, ঠিক ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলা গেছে, এই ঘুমটি এল বলে!...

কিন্তু এ কী! জগদীশের গান শোনবার জন্যে কে এসে সামনে বসে আছে, ল্যাজটি উঁচিয়ে, মুখটিতে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে?

এ তো আচ্ছা বিপদ হল!

হল! সেই থেকে চলল বিপদ! চলে আসছে এই বেয়াল্লিশটি রাত ধরে।... যেই চোখটি বোজার চেষ্টা করেন, সেই একটি কালো বেড়াল সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।...তা ক্রমশঃ আর একটি নয়, দুটি চারটি দশটি। হাঁটছে, চলছে, ঘুরছে ফিরছে। জগদীশের ঘর কালো বেড়ালে ভরে উঠছে।

জগদীশ ওদের চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে দোহাতা হাতী, গণ্ডার, বাঘ সিংহ, ভাল্লুক, বুনোমোষ, দোতলা বাস, সীমেণ্ট বোঝাই লরী, বেপরোয়া আম-দানী করতে থাকেন, কিন্তু কোথায় কি! ওই সব বিরাটেরা কোথায় উপে যায় কর্পূরের মত, বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায় শুধু এরা।

এখন বুঝতে পারছেন জগদীশ, ভুনি পিসি কেন বলেছিলেন, কালো বেড়াল ভাবতে নেই, ভাবাটা খারাপ। সত্যি এর থেকে খারাপ আর কি হতে পারে। অথচ সেই ভাবছেনই। জগদীশ আজ জলজ্যান্ত একটা লোকের নাক কামড়ে দিয়েছেন। লোকটা আবার জগদীশের দাবার বন্ধু।

প্রতিকারের উপায় জানতে যে ভুনি পিসির কাছে যাবেন, তারও উপায় নেই। তিনি এখন কেদার বদরী, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠিকানা জানার পথ নেই।

যাক্ ভুনি পিসি না এলেও গুরুদেব এলেন।

বললেন, 'কি সংবাদ?'

নন্দরানী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, সংবাদ আর কি বাবা! ওর মুখেই শুনুন। বল বাবা, তোর কি কষ্ট!

জগদীশ মাথায় জলের হাত বুলিয়ে দাঁড়ানো চুলকে শুইয়ে, আর চোখে জলের ছাট দিয়ে দিয়ে টকটকে চোখকে গোলাপী করে এনে মায়ের গুরুদেবকে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন মায়ের নির্দেশে গম্ভীরভাবে বলেন, কষ্ট কিছুই না। শুধু গোটা-কতক কালো বেড়াল!

কালো বেড়াল!

মা শিউরে বলেন, 'কোথায়?'

জগদীশ নিজের মাথাটা দেখিয়ে দেন।

গুরুদেব মৃদু হেসে বলেন, 'বুঝেছি।'

'বুঝেছেন? কী বুঝলেন?'

'বুঝলাম, উৎপাত বাড়িয়েই চলেছে, তাড়ান দরকার।'

নন্দরানী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা।'

গুরুদেব স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'পারবে মা পারবে। পরে সব বলছি, এখন তাড়াতাড়ি একটু হোমের ব্যবস্থা করে দাও। ও ক'টাকে আহুতি দিয়ে ফেলতে হবে।

জগদীশ বসে পড়ে বলেন, 'পারবেন প্রভু?'

গুরুদেব একটু অলৌকিক হাসি হাসলেন।

তারপর সারাদিন ধরে যাগযজ্ঞ হোম। নন্দরানী উপবাস করে আছেন, জগদীশও প্রায় তাই। শুধু সকালে একটু চা টোস্ট, দুপুরে একটু দুধ চিঁড়ে, আর বিকেলে একটু কেক বিস্কুট আর চা।

সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব একটি মাদুলী হাতে নিয়ে বললেন, 'হোম ভস্ম' ভরা এই মাদুলিটি রাত্রি এক প্রহরের সময় ধারণ করবে, দেখবে অব্যর্থ!

'তারা আর আসবে না? ল্যাজ দুলিয়ে, গাল ফুলিয়ে?'

'কোথা থেকে আসবে? আমি তো তাদের হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়ে দিয়েছি।'

জগদীশ গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলেন, 'মাদুলির নিয়ম-টিয়ম?'

'কিছুই না। শুধু—'

শুধু কি গুরুদেব?'

গুরুদেব একটুখানি রোমাঞ্চময় হাসি হেসে বলেন, 'শুধু ধারণের পূর্বে অন্তত বিছানায় শোবে না, আর হাই তুলবে না। হাই তুললেই মাদুলি ধারণ নিষিদ্ধ।'

জগদীশ গম্ভীর হলেন, গুরুদেব বলেই একটু সাধুভাষা ব্যবহার করলেন। বললেন, 'গুরুদেব কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন?'

'কী বল বৎস! তোমার সঙ্গে কি আমার পরিহাসের সম্পর্ক?'

'তবে ওই নিষেধটি কেন? জানেন আজ একমাস চোদ্দদিন জগদীশ হতভাগা 'হাই' কাকে বলে জানে না! 'হাই'-য়ের মানে ভুলেছে, বানান ভুলে গেছে।

মৃদু হাসি হাসেন গুরুদেব।

বলেন, 'তাহলে তো ভালই।'

গুরুদেবের খাতিরে দেদার ক্ষীর রাবড়ি, ছানা মাখন, সন্দেশ রসগোল্লা, গুঁজিয়া প্যাঁড়ার আমদানী হয়েছিল, তার কিছুটা শেয়ার নিয়ে জগদীশ ঘড়ি হাতে বেঁধে বিছানায় বসলেন। এখন নটা। ঠিক দশটায় মাদুলিটি ধারণ করবেন।

মনে বড় আনন্দ।

একটা অব্যর্থ ওষুধ পেয়ে গেছেন।

দশটা বাজলেই লাল সুতোটা গলায় গলিয়ে শুয়ে পড়া।

কিন্তু কি সর্বনাশ!

এটা কি হল!

স্পষ্ট পরিস্কার আস্ত সুস্থ একটি হাই উঠলো না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, সত্যি-

কার একটি গোলগাল হাই।

মাদুলি ধারণ হল না। জগদীশ অবাক হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাবলেন, ঠিক আছে, আর একটা ঘণ্টা পরেই পারা যাবে। দৈবাৎ একটা হয়ে গেছে, কী আর করা!

কিন্তু, এ কী?

এটা কী সর্বনেশে ব্যাপার!

আবার! আবার! মুহুর্মুহু! হাঁ না বুজতেই আবার হাই! যতবার ঠিক করছেন এবার একটা ঘণ্টা খুব অবহিত হয়ে বসে থেকে—ততবারই ওই একই ঘটনা। একঘণ্টা তো দূরের কথা, দশটা মিনিটও ফাঁকা পাচ্ছেন না।

এদিকে ঘড়ি এগিয়ে চলেছে।

জগদীশের চোখ জুড়ে আসছে, ঘন ঘন হাইয়ের দরুণ শরীর বিছানায় গড়িয়ে পড়তে চাইছে, শুতে পাচ্ছেন না, মাদুলি ধারণ না করে শোবার হুকুম নেই।

জগদীশ উঠে পড়েন, পায়চারি করেন, জল খান, চোখে মুখে জল দিয়ে আলস্য তাড়ান, জোরে জোরে গাইতে থাকেন, 'কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই—'

কিন্তু কথা জড়িয়ে যায়।

গুরুদেবের ভোরে ব্রেকফাস্টের অভ্যাস!

নন্দরানী অন্ধকার থাকতে উঠে ফল কাটছেন, মাখন মিশ্রী গোছাচ্ছেন, হঠাৎ হাত থেকে রুপোর রেকাবিটা পড়ে গেল ঝনঝনিয়ে, নন্দরানী শিউরে উঠলেন। গুরুদেবও মালা জপতে জপতে থমকে গেলেন, কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'মা নন্দরানী, তো-তো-তোমাদের এদিকে কি বাঘটাঘ বেরোয়?

ততক্ষণে নন্দরানী ধাতস্থ হয়েছেন, রেকাবি তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুতে ধুতে বলেন, 'দর্জিপাড়ার গলিতে আর বাঘ বেরোবে কোনখান থেকে বাবা? ও অন্য শব্দ।'

গুরুদেবের থালায় এককুড়ি সন্দেশ চাপালেন নন্দরানী, মিশ্রীর সঙ্গে হাফ কিলো মাখন।

এদিকে বাড়ির সকলেরও অনেকদিনের অনভ্যাস! আজকেটা ধরলে দেড়টা মাস। সকলেই ওই 'অন্য' শব্দের ধাক্কায় সুখসুপ্তি ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে এসে এই ঘরেই এসে জড় হয়, আর অভয় সভক্তিতেএকে একে গুরুদেবকে প্রণিপাত করে, সোজা সাষ্টাঙ্গে।

মায় স্বপনকুমারও।

তবে সে একটু ঘুম কাতুরে, তাই দাওয়ার ধারে বসে চোখ রগড়াতে থাকে, আর একটির পর একটি হাই তুলতে থাকে।

ওদিকে শব্দ বাড়তেই থাকে।

ভীম গর্জনে!

বিপুল পুলকে!

ধাপে ধাপে, ঝলকে ঝলকে।

জগদীশের ছোট ছাই অবনীশ চাপা গলায় বলে, 'অনেকদিন গ্যাপ দেওয়ার দরুণ তেজটা যেন বেড়েছে মনে হচ্ছে।'

ছোট ভাইয়ের বউ রেখা আরো আস্তে বলে, 'আমাদের ঘুমের আবার বারোটা বাজল!'

বাজুক! কার কোথায় কিসে বারোটা বাজছে, তা দেখে আর কে সংসারে ঘুরছে?

সে শব্দ থামল বিকেলের দিকে।

গুরুদেব যখন আহারাদি করে, বিশ্রামান্তে বাড়ি ফেরার তাল করছেন।

জগদীশ তাড়াতাড়ি নেমে এসে লজ্জিত ভাবে প্রণাম করলেন।

গুরুদেব হাসিমুখে বললেন, কি? তারা আর উৎপাত করতে এসেছিল?'

জগদীশ চমকে উঠে সারারাতের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'কই? না তো।'

'বেশ বেশ! বিষে বিষক্ষয়! তা মাদুলিটা ধারণ করেছ তো?'

জগদীশ মাথা চুলকে বললেন, কই আর? এমন একখানা কড়া নিয়ম দিলেন!'

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

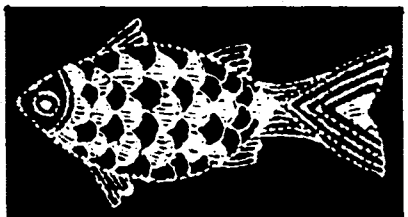

গণ্ডারের চামড়ায় গুলি ঢোকে না?

কথায় বলে গণ্ডারের চামড়া। মানে ভীষণ পুরু। যে-লোকের লজ্জা, মান-অপমানজ্ঞান থাকে না, তার গায়েও গণ্ডারের চামড়া হয়। গণ্ডারের চামড়ায় গুলি ঢোকে না—এই কথাটা বহুদিন ধরে চলে আসছে। ঢোকে যেখানে খাঁজ থাকে, কম্বলের মতো চামড়ার যে-সব জায়গায় ভাঁজ পড়ে, সেইখানে। কিন্তু কথাটা মোটে সত্যি নয়। ডাঃ ডরু রীড ব্লেয়ার তাঁর 'চিড়িয়াখানা' বইয়ে জানিয়েছেন : ভারতীয় গণ্ডারদের গায়ের চামড়া বেজায় পুরু। দেখতেও শক্ত—তাই বহুকাল ধরে মনে করা হত গণ্ডারের চামড়া হল বুলেটপ্রুফ। ঢালের মতো পাত আছে গণ্ডারের শরীরে। এক যদি তার ফাঁকে গুলি চলে যায়, তাহলে আলাদা কথা। আসলে কিন্তু গণ্ডারের চামড়া বেশ নরম। শরীরের যে-কোন জায়গায় গুলি কিংবা শিকারীর ছুরি বসে যেতে পারে। কিন্তু সেই চামড়া শুকিয়ে গেলে ভীষণ শক্ত আর মোটা হয়ে যায়। আগেকার কালে ভারতীয় রাজারাজড়ারা গণ্ডারের চামড়া থেকে সৈন্যদের বর্ম বা ঢাল তৈরী করাতেন। লড়াইয়ের সময় ঢাল বা বর্ম ভেদ করে ছুরি কিংবা তীর ঢুকতে পারত না। সেই থেকে এই বিশ্বাস চলে আসছে, গণ্ডারের চামড়া এত শক্ত যে গুলি ঢোকে না। পূর্ব আফ্রিকায় বড় বড় শিকারীরা গণ্ডার মারতে ০৪৫ ক্যালিবারের রাইফেল ব্যবহার করেন। গণ্ডারের শরীরে দুটি জায়গা খুব মোক্ষম—শিকারীদের ভারি পছন্দ। এক হল হার্ট শট—সামনের ডান পায়ের ওপর দিয়ে বুকে। আর একটি হল, নেক শট। কানের আট ইঞ্চি পাশ দিয়ে কাঁধের কাছে। যাতে কাঁধের হাড় ভেঙে ফেলা যায়। ইথিওপিয়ায় এখনো গণ্ডারের চামড়া শুকিয়ে যুদ্ধের ঢাল করা হয়।

বিজাপুরের সবচেয়ে বড় সেনাপতি আফজল খাঁ চললেন শিবাজীকে শায়েস্তা করতে। এই 'পাহাড়ি ইঁদুরের' জ্বালায় আর পারা যায় না। একের পর এক দুর্গ দখল করে নিচ্ছেন তিনি। হানা দিচ্ছেন নতুন নতুন এলাকায়। ছলে, বলে কৌশলে—যেমন করে হোক ধরে আনবো তাঁকে, আফজলের এই সংকল্প। জ্যান্ত যদি না পারি, তবে ধড় থেকে মুণ্ডটা কেটে নিয়ে আসবো, মনে মনে হলপ করলেন তিনি।

তুলজাপুরের পর ওয়াই। লুঠ করতে করতে এগিয়ে চলল বিজাপুর বাহিনী। ওয়াই-এ এসে থমকে দাঁড়াতে হল আফজল খাঁকে। কারণ,—বর্ষা। মাস কয়েক এখানে বিশ্রাম নেওয়াই ভাল। লড়াই যদি করতেই হয় তবে সে করা যাবে শরতে,—আকাশ যখন ফুটফুটে নীল, রোদ্দুরের রঙ সোনালি। তার আগে একবার অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখা যাক এই মারাঠী নায়ককে হাতে পাওয়া যায় কি না। কৃষ্ণজী ভাস্কর নামে এক মারাঠীকে দূত হিসাবে শিবাজীর কাছে পাঠালেন আফজল। সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব। শিবাজী তখন প্রতাপগড় কেল্লায়। তিনি কৃষ্ণজীকে চেপে ধরলেন—খাঁ সাহেবের আসল মতলব কি তা-ই বল দেখি।

কৃষ্ণজী আফজল খাঁর বিশ্বস্ত দূত। তিনি সব ভেঙ্গে বলবেন কেন? তবে তাঁর কথাবার্তা শুনে শিবাজীর সন্দেহ হলো। আফজল তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চান। তিনি আপসের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সে-খবর নিয়ে কৃষ্ণজীর সঙ্গে আফজল খাঁর শিবিরে চললেন গোপীনাথ পন্থ নামে শিবাজীর দূত। গোপীনাথের আর এক কাজ ভেতরের খবর জানা। ফিরে এসে তিনি বললেন—সন্দেহ অমূলক নয়। আপনার অনিষ্ট করাই খানের মতলব। শিবাজী বললেন—আচ্ছা, দেখা যাক।

যেন তিনি খুব ভয় পেয়েছেন। শিবাজী আফজল খাঁকে বলে পাঠালেন—আমি ওয়াই যেতে পারবো না। খাঁ সাহেব আপনি বরং আসুন। আফজল রাজী হয়ে গেলেন। বন কেটে তাঁর বাহিনীর জন্য পথ করে দিল মারাঠীরা। পথের বাঁকে বাঁকে অঢেল খাদ্য আর পানীয়ের বন্দোবস্ত। প্রতাপগড়ের এক মাইল দূরে পার নামে একটা গাঁয়ে এসে ছাউনি ফেললেন আফজল খাঁ। শিবাজী বললেন—ঠিক আছে। আজ বিশ্রাম। কাল সাক্ষাৎকার।

দুর্গের গায়েই একটা উঁচু জায়গায় তৈরী হয়েছে মঞ্চ। মস্ত শামিয়ানা। কার্পেট। গালিচা। কিংখাব মখমলের ছড়াছড়ি। সাজসজ্জা দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন আফজল খাঁ। সুন্দর চেহারা তাঁর। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। কোমরে ঝুলছে তাঁর বাহারি তলোয়ার। আফজল তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন।

শর্ত ঃ সাক্ষাৎকারের সময় দুই দূত ছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে দু'জন করে অনুচর। কিন্তু আফজল সঙ্গে নিয়ে এসেছেন একজন বাড়তি প্রহরী। দূর থেকে দেখেই শিবাজী দাঁড়িয়ে পড়লেন—ওকে বাইরে পাঠাতে হবে। আফজল আপত্তি করতে পারলেন না। সেই দেখতে-ভয়ানক লোকটা বেরিয়ে গেল। শিবাজী সামিয়ানার তলায় এলেন। ছিপছিপে ছোটখাটো মানুষটি। গায়ে ফুলকাটা আচকান। মাথায় পাগড়ি। কিন্তু কোমরে তলোয়ার নেই তাঁর। সেটাই স্বাভাবিক। এ-বৈঠক সমানে সমানে নয়। আফজল খাঁর তুলনায় মর্যাদায় শিবাজী খাটো। তাছাড়া, বলতে গেলে আত্ম-সমর্পণ করতে এসেছেন তিনি। এ সময় তলোয়ার তাঁকে মানায় না।

শিবাজীকে দেখেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আফজল খাঁ। ক'পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন তাঁকে। উষ্ণ আন্তরিক আলিঙ্গন। কিন্তু এ কি? শিবাজীর মনে হলো আফজলের বাঁ হাতটা যেন তাঁর কাঁধে ক্রমেই চেপে বসছে। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবে কি আফজল তাঁকে মেরে ফেলতে চান? হ্যাঁ, এতে আর সন্দেহ কি! আফজল ডান হাতে তলোয়ার টেনে নিয়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন শিবাজীর পেটের বাঁ দিকে। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। পলকে মনস্থির করে ফেললেন শিবাজী। পলকে পালটা আঘাত। পরক্ষণেই দেখা গেল আফজল খাঁ শিবাজীকে ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গায়ে রক্তের ফোয়ারা। পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে।

সেদিন ১০ নভেম্বর, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। বার মনে নেই।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। বিজাপুরের সেরা সেনাপতি আফজল খাঁ আর প্রতাপগড় থেকে ফিরতে পারেননি। শিবাজীর ইঙ্গিতে বিধ্বস্ত হয়েছিল বিজাপুর বাহিনী। তারপর থেকে শিবাজী আরও দুঃসাহসী, আরও দুর্দম।

কিন্তু প্রশ্নঃ শিবাজীকে কেন মারতে চেয়েও মারতে পারলেন না আফজল খাঁ, আর নিরস্ত্র শিবাজীই বা কেমন করে সম্ভব করলেন এই অসম্ভব কাণ্ড,—আফজল-হত্যা ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরঃ শিবাজীর আচকানের তলায় ছিল বর্ম। পাগড়ির নীচেও ছিল একটা লোহার বাটি। আফজলের তলোয়ার তাই সুবিধে করতে পারেনি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ শিবাজী মোটেই নিরস্ত্র ছিলেন না। তাঁর ডান হাতের আস্তিনের তলায় ছিল হাল্কা একটা ছুরি। নাম তার—'বিচ্ছু'। আর বাঁ-হাতে ছিল অদ্ভুত ওই ছোট্ট হাতিয়ারটি। দুটি আংটি, আর ধারালো ক'টি লোহার বাঁকা নখ। শিবাজীর বিখ্যাত 'বাঘ-নখ'। আফজলের পেটে এটিই বসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ইতিহাসের সেই নাটকীয় হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী এই অংটিটি এখনও রয়েছে পুনা জাদুঘরে। আর সেই থেকেই বোধহয় মুখে মুখে ফিরছে একটি প্রবাদ—'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, আধ হাত তফাত!'

শ্রীপান্থ

উপন্যাস

বিমল কর

কাপালিকরা এখনও আছে

কত বিচিত্র ঘটনাই না জগতে ঘটে যায়। তারাপদর জীবনে যেমন ঘটল আজ।

সকালে খুব বিরস মুখে তারাপদ ঘুম থেকে উঠেছিল। ঘুম ভাঙার মুখে মুখে যদি মনে পড়ে যায়, মেসের বটুকবাবুকে গোটা তিরিশেক টাকা অন্তত দিতেই হবে আজ, নীচের জগন্নাথ চা-অলাকেও পাঁচ সাত টাকা, তা হলে কারই বা ভাল লাগে! লোকের কাছে ধার-দেনার কথা, নিজের অভাবের কথা মনে হলে ভাবনা-চিন্তা বেড়েই যায়, আরও কত রকম ধারটারের কথা মনে পড়ে, কত রকম অভাব এসে দেখা দেয়। তারাপদরও সেই রকম হল : মনে পড়ল—আজ লণ্ড্রি থেকে জামাটামা আনতে হবে, তা তাতেও দেড় দু টাকা ; নীলুর মনিহারী দোকান থেকে একটা সাবান, নিদেন পক্ষে একটা কি দুটো ব্লেড আনতে গেলে সেও বাকি সতেরো টাকার জন্যে হাত পেতে বসবে। এই রকম আরও কত টুকটাক। না, এ আর ভাল লাগে না! এই ভাবে কি বাঁচা যায়, দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে তারাপদর মনে হয়, এ জীবন রেখে লাভ নেই ; তার চেয়ে একদিন 'জয় মা' বলে ডবল্ ডেকারের তলায় ঝাঁপ দেওয়াই ভাল।

বিরক্ত বিরস মুখ করে তারাপদ উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। তার ঘরের জানলা বন্ধ, দরজা খোলা। শীতের দিন বলেই যে জানলা বন্ধ তা নয়, এখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে, জানলা খুলে দেওয়া যেত। কিন্তু তার রুম-মেট বঙ্কিমদা কখনো সকালে জানলা খুলবেন না। কেননা, জানলাটা খোলা এবং বন্ধ করার মধ্যে কলা-কৌশল আছে। জানলার দুটো পাটই আলগা, প্রায় কব্জাবিহীন, হিসেব করে না খুললেই একটা পাট সোজা নীচে বটুকবাবুর মাথায় গিয়ে পড়তে পারে, আর-একটা হয়ত মাঝপথে কোথাও ঝুলতে থাকবে। নারকোল দড়ি, লোহার ছোট শিক—এই সব মালমশলা দিয়ে তারাপদ কোনো রকমে ঘরের জানলা দুটোকে ধরে রেখেছে, যদি না রাখত—এই ঘরে জানলা বলে কিছু থাকত না। তারাপদ খুব বিবেচক। বাড়ির দোষ সে দেয় না। একশো সোওয়া শো বছরের পুরোনো বাড়ির হাল এর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে! গলির গলি তার মধ্যে বাড়িটা নড়বড়ে চেহারা নিয়ে, কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ির মতন ইটকাঠের আবর্জনা হয়ে যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তাই যথেষ্ট। যদি গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনের ওই বাড়ি না থাকত—কোথায় যেত তারাপদ? আজকের দিনে মাথা গোঁজার জন্যে তার মাত্র ন' টাকা খরচ হয় মাসে মাসে। বটুকবাবু এ বাড়ির জন্যে সিট্ রেণ্ট বাবদ মাথা পিছু ন' টাকা নেন। তাতেও তাঁর লাভ থাকে। আটান্ন টাকা মাসিক ভাড়ার বাড়ি। অবশ্য পুরোনো ভাড়াই চলছে। জনা দশেক মেম্বার মেসের।

তারাপদ ঘরের এক কোন থেকে তার টুথব্রাশ তুলে নিয়ে আবার বিরক্ত হল। পেস্ট নেই। পরশুই ফুরিয়ে গিয়েছিল। গতকাল কোনো রকমে পেস্টের মুণ্ডু টিপে একটু পাওয়া গিয়েছিল, দাঁত মাজার কাজটা তাতেই সেরেছে কাল। সারাদিন আর টুথপেস্টের কথা মনে হয়নি।

এক চিলতে সাবানের ওপর ব্রাশ ঘষে নিয়ে মুখ ধুতে যাবার সময় তারাপদর মনে পড়ল, আজ শনিবার। একুশ তারিখ। শনিবার দিনটা এমনিতেই ভাল যায় না তারাপদর, তার ওপর একুশ তারিখ। একুশ তারিখটা তার পক্ষে ভাল নয়। তিন সংখ্যাটাই তার ভাগ্যে সয় না। একুশ, মানে দুই আর এক—সংখ্যা দুটো পাশা-পাশি রাখলে তাই হয়। দুই আর এক যোগ করো, তিন। খারাপ। তার ওপর আবার একুশকে শুধু তিন আর সাত দিয়ে ভাগ করা যায়, করলে মিলে যায়। তিন দিয়ে মেলানো অশুভ। আবার সাত দিয়ে ভাগ করলে সেই তিন। মানে, যোগ আর ভাগ দু দিকেই একুশ সংখ্যাটা এত খারাপ তারাপদর পক্ষে যে তাকে ডবল খারাপ বলা যায়।

দিনটা যে আজ খুবই খারাপ যাবে সকাল থেকেই তারাপদ তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই টাকার চিন্তা, কোথায় বটুকবাবু, কোথায় নীলু, কোথায় লণ্ড্রী। মুখ ধোবার পেস্ট পর্যন্ত জুটল না।

গায়ে মাখা সাবানের টুকরোটার ওপর টুথ ব্রাশ ঘষে তারাপদ খুবই ভারী, অপ্রসন্ন মনে মুখ ধুতে চলে গেল।

মাত্র ক' ঘণ্টা পরেই কিন্তু সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল।

বেলা সাড়ে বারোটাও বাজেনি তারাপদ হন্তদন্ত হয়ে চন্দনের মেডিক্যাল হোস্টেলে গিয়ে হাজির। চন্দন ঘরেই ছিল। দাবা খেলছিল বন্ধুর সঙ্গে। সবে এম-বি পাশ করেছে চন্দন, পাশ করে পি আর সি-তে আছে।

তারাপদকে এমন অসময়ে আসতে দেখে চন্দন বলল, "কি রে? হঠাৎ?" বলতে বলতে সে তারাপদর খানিকটা উত্তেজিত, খানিকটা বা বিমূঢ় মুখ দেখতে লাগল।

তারাপদ হাঁপাচ্ছিল। শীতের দিন হলেও তার মুখে যেন সামান্য ঘাম ফুটেছে। চুলটুল রুক্ষ; শুকনো শুকনো চেহারা।

তারাপদ দম টেনে বলল, "চাঁদু, তোর সঙ্গে সিরিআস কথা আছে।"

"বল্," বলে চন্দন তার দাবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

তারাপদ বলব কি বলব না মুখ করে বসে থাকল। তৃতীয় জনের সামনে তার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

চন্দন তার দাবা খেলার বন্ধুকে চোখের ইশারায় আপাতত উঠে যেতে বলল। বন্ধুটি স্নান করতে যাচ্ছিল, তার কাঁধে তোয়ালে ঝোলানো, সে চলে গেল।

বিছানার মাথার দিক থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই উঠিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল চন্দন, বলল, "কি তোর সিরিআস কথা, বল?"

তারাপদ নিজের উত্তেজনা সামান্য সামলে নিয়ে বলল, "চাঁদু, সাঙ্ঘাতিক একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আমি একটা চিঠি পেয়েছি, আজ, খানিকটা আগে; রেজিস্ট্রি করে এসেছে।"

"কিসের চিঠি? চাকরির?"

"আরে না না—চাকরির নয়," বলতে বলতে তারাপদ পকেট থেকে খামে মোড়া একটা চিঠি বের করল। "চিঠিটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেছে। কিছু বুঝতে পারছি না...।" বলে তারাপদ খামসমেত চিঠিটা চন্দনের হাতে দিল।

চিঠি নিল চন্দন। রেজিস্ট্রি করা চিঠি, উইথ্ এ ডি। খামের মুখ ছেঁড়া। চন্দন চিঠিটা বের করে নিল। ছাপানো প্যাডে ইংরেজীতে লেখা চিঠি। যেন খানিকটা পোশাকী ব্যাপার।

প্রথমটায় চন্দন তেমন মন দিতে পারেনি। চিঠির মাঝামাঝি এসে তার কেমন চমক লাগল। তারাপদর দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার মন দিয়ে প্রথম থেকে চিঠিটা পড়তে লাগল।

চিঠি পড়া শেষ করে চন্দন অবাক হয়ে বলল, "এ তো কোনো সলিসিটারের চিঠি বলে মনে হচ্ছে রে।"

তারাপদ মাথা নেড়ে বলল, "মনে হবার কি আছে, লেটার প্যাডের মাথায় তো লেখাই আছে, ভদ্রলোক সলিসিটার।"

"কিন্তু সলিসিটাররা অফিস থেকে চিঠি দেয় বলে শুনেছি। এটাতে বাড়ির ঠিকানা দেওয়া আছে।"

"চিঠিটা খানিকটা পার্সোন্যাল বলে বোধ হয়।"

চন্দন আরও একবার চিঠিটা পড়তে পড়তে সিগারেট খেতে লাগল।

তারাপদ বলল, "কিছু বুঝলি?"

চন্দন বলল, "খানিকটা বুঝলাম। ভদ্রলোক তোকে পত্রপাঠ দেখা করতে বলেছেন। বিষয়সম্পত্তির একটা বড় ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সলিসিটার ভদ্রলোক যাঁর কথা লিখেছেন, ওই ভুজঙ্গভূষণ হাজরা উনি কে?"

তারাপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি ভাই এ-রকম নাম কখনো শুনিনি। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারছি না। তবে মা বেঁচে থাকতে শুনেছিলুম—সাঁওতাল পরগণার দিকে আমার এক পিসিমা থাকতেন,

তাঁরা হাজরা ছিলেন। পিসিমার নাম বোধ হয় ছিল সুবর্ণলতা। পিসেমশাই নাকি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। আমার মনে হচ্ছে, ভুজঙ্গভূষণ আমার সেই পিসেমশাই। চিঠিতে তো আর কিছু লেখা নেই তেমন।"

চন্দন চিঠিটা মুড়ে খামের মধ্যে ঢোকাল। অন্যমনস্ক। পরে বলল, "বোধ হয় ভুজঙ্গভূষণ তোকে বিরাট কোনো সম্পত্তিটম্পত্তি দিয়ে গেছেন..." বলে হাসল চন্দন, "দেখ্, রাজত্বটাজত্ব পেয়ে যেতে পারিস।"

তারাপদ বলল, "আমার তিন কুলে কেউ নেই। টিউসানি করে আর বটুকবাবুর মেসে ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। একটা চাকরি পর্যন্ত জোটাতে পারলাম না। যাও বা একটা জুটেছিল হাতাহাতি করে ছেড়ে এলাম। আমার কপালে ভাই রাজত্ব বর্তাবে না।"

চন্দন হেসে বলল, "বর্তে যাবে রে. তার হিন্টস্ রয়েছে চিঠিতে। তুই বড়লোক হয়ে যাবি। নে লেগে পড়।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। তার পর বলল, "কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে, তুই লক্ষ করেছিস?"

"কি?"

"প্রথমত ধর, আমার ঠিকানা এরা পেল কি করে? যদি ধরেই নি ভুজঙ্গভূষণের বিষয়সম্পত্তি আমার জন্যে বসে বসে কাঁদছে, তবু ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতন নয় কি? আমার ঠিকানা সলিসিটার মশাই জানলেন কি করে? কেমন করে বুঝলেন আমি ভুজঙ্গভূষণের আত্মীয়? যদি আমার ঠিকানা জানাই থাকবে তবে সেই ভুজঙ্গভূষণ কেন আমায় নিজে চিঠি লিখলেন না?"

চন্দন আচমকা বলল, "ভুজঙ্গভূষণ হয়ত মারা গিয়েছেন।"

"মারা গিয়েছেন?"

"মারা গেলেই এইসব বিষয়সম্পত্তির ওয়ারিশানের কথা ওঠে।"

"তা আমায় কেন?"

"তুই-ই বোধ হয় একমাত্র মানুষ যে কিনা ভুজঙ্গভূষণের জীবিত আত্মীয়।"

তারাপদ চুপ করে থাকল, অন্যমনস্কভাবে লক্ষ করতে লাগল, ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দমকা বাতাসে নড়ে নড়ে যাচ্ছে।

চন্দন বলল, "তুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?"

"ব্যাপারটা আমার কাছে খুব গোলমেলে লাগছে।"

"গোলমালের কি আছে, তুই আজ সোজা ওই সলিসিটার ভদ্রলোক—কি যেন নাম—মৃণালকান্তি দত্ত, তাই না—, তাঁর কাছে চলে যা। গিয়ে দেখা কর।"

"তারপর?"

"দেখা করে দেখ, কি বলেন ভদ্রলোক। কেন তোকে যেতে বলেছেন।"

"কিন্তু আমি যে ভুজঙ্গভূষণের আত্মীয়, তার প্রমাণ কি? নামে মিললেই মানুষ এক হয় না। আমি তো জাল হতে পারি।"

মাথা নেড়ে চন্দন বলল, "জাল ভেজাল প্রমাণ হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের কাছে নিশ্চয় কোনো প্রমাণ আছে। ত ছাড়া যদি তোর সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবর ও-পক্ষ না রাখত তবে তোর ঠিকানায় চিঠি আসত না।"

তারাপদ চুপ করে থাকল। চন্দন যা বলছে এসব চিন্তা যে তার মাথায় আসে নি এমন নয়। চিঠি পাবার পর থেকে সে অনবরত ভেবেই যাচ্ছে, ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য। তারাপদ ভাবতেই পারছে না, যে ভুজঙ্গভূষণকে সে জীবনে চোখে দেখে নি, যার নাম শোনে নি, সেই লোক সত্যি সত্যি তারাপদর জন্যে বড়সড় কোনো বিষয়-সম্পত্তি রেখে যেতে পারে! বরং এ-সব ব্যাপারে এমন একটা রহস্য রয়েছে যে, না জেনে না বুঝে এগুতে গেলে বিপদে পড়ে যেতে পারে। গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে গেলেই বিপদ।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে তারাপদ বলল, "তুই যেতে বলছিস?"

"আলবত্ যাবি।"

"আমার কেমন নার্ভাস লাগছে।"

"কিসের নার্ভাস—! তোকে কি সলিসিটার খেয়ে ফেলবে? তুই কি নিজে যাচ্ছিস? তোকে দয়া করে যেতে বলেছে বলে তুই যাচ্ছিস।"

"তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

"আমি?"

"উকিল অ্যাটর্নি শুনলেই আমার ভয় করে। তাছাড়া ওই যে কি ঠিকানা—কত নম্বর ওল্ড আলিপুর—ও সব ভাই আমি চিনি না। চল্ তুই...।"

"বিকেলে আমার যে অন্য দরকার ছিল রে!"

"ক্যানসেল করে দে।...তোর এমন কোনো কাজ নেই। হাসপাতালের চাকরিরও যা বাহার।"

একটু কি ভাবল চন্দন, তারপর বলল, "বেশ, তা হলে বিকেল বিকেল চল। শীতের দিন। পাঁচটা বাজতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

তারাপদ যেন আশ্বস্ত হল খানিকটা। হঠাৎ আবার চোখ পড়ে গেল ক্যালেন্ডারটা। তারাপদ বলল, "চাঁদু, আজ কিন্তু আমার দিনটা ভাল নয়।"

"মানে?"

"একে শনিবার, তায় একুশ তারিখ। তিন হল আমার আনলাকি নাম্বার।"

চন্দন হেসে উঠল। গালাগাল দিয়ে বলল, "তোর যত কুসংস্কার। এ সব মাথায় কে ঢোকায় রে? ...আমি তো দেখছি আজ তোর সাঙ্ঘাতিক দিন, এ ডে অফ ফরচুন।"

তারাপদ তখনও খুঁতখুঁত করতে লাগল।

শেষে চন্দন বলল, "আমার এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি। তুই মেসে যা। ঠিক চারটের সময় ওয়েলিংটনের মোড়ে থাকবি। আমি আসব।"

তারাপদ উঠল। অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে।

আলিপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। ডিসেম্বর মাসের এই সময়টা এই রকমই, বিকেল ফুরোবার আগেই সব ঝাপসা, ঝপ করে যেন অন্ধকার নেমে আসে আকাশ থেকে। জায়গাটাও কেমন নিরিবিলি। পুরোনো আলিপুরের সেই সব প্রাচীন, বনেদী বাড়ি-ঘর এদিকে; রাজা রাজড়ার এলাকা যেন, উঁচু উঁচু দেওয়াল ঘেরা বাড়ি, মস্ত মস্ত গাছ, ফটকে দরোয়ান, ভেতরে অ্যালসেসিয়ান কুকুরের গর্জন, ঝকঝকে গাড়ি বেরুচ্ছে, ঢুকছে, রাস্তাটাস্তা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। তারাপদর কেমন গা ছমছম করছিল। সে বেচারী বউবাজারের দিকে থাকে, গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনে, যেখানে আলো বাতাসটুকুও ঢুকতে ভয় পায়, গাছটাছ তো দূরের কথা কোথাও একটা সবুজ পাতা পর্যন্ত দেখা যায় না—সেই তারাপদ এরকম

একটা জায়গায় এসে ঘাবড়ে যাবে না তো কি হবে!

তারাপদ বলল, "চাঁদু, এ দিকে এলে মনেই হয় না এটা কলকাতা, কি বল?"

চন্দন দু পাশের বাড়ি, বাগান, গাছপালা দেখতে দেখতে হাঁটছিল ধীরে ধীরে; সলিসিটার দত্ত-র বাড়ির নম্বর খুঁজছিল। ততক্ষণে রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে, মাথার ওপর আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িটা পাওয়া গেল। আশেপাশের বাড়ির তুলনায় ছোট। পুরোনো আমলের বাড়ি। সামনে বাগান ছোট মতন।

ফটকের সামনে কেউ ছিল না। তারাপদ ঢুকতে চাইছিল না, যদি অ্যালসেসিয়ান তেড়ে আসে।

চন্দন বলল, "কুকুর নেই, থাকলে বাঁধা আছে; চলে আয়—।"

ফটক খুলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। তারাপদর ভয় করছিল। তার ওপর শীতটাও যেন বেচারীকে জাপটে ধরেছে, কাঁপতে লাগল তারাপদ।

অল্প এগিয়ে গাড়ি বারান্দা।

গাড়ি বারান্দার সিঁড়িতে উঠে একজনকে দেখতে পাওয়া গেল। বুড়ো মতন একটি লোক। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মোটা চাদর।

তারাপদদের দেখতে পেয়ে লোকটি কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর কাছে এল। তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে জিজ্ঞেস করছে, কাকে চাই আপনাদের?

চন্দন বলল, "আমরা বউবাজার থেকে আসছি। মিস্টার দত্ত আমাদের দেখা করতে বলেছেন।" বলে চন্দন তারাপদকে দেখিয়ে দিল। "বাবু এঁকে চিঠি লিখেছেন দেখা করার জন্যে। এঁর নামটা বলো গিয়ে বাবুকে।" চন্দন তারাপদর নাম ঠিকানা বলল।

তারাপদদের অপেক্ষা করতে বলে লোকটি চলে গেল। দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চার-পাশ দেখতে লাগল। এক সময় নিশ্চয় বিস্তর পয়সা ছিল বাড়ির মালিকের, সাজিয়ে গুছিয়ে বাড়ি করেছিল, এখনও তার প্রমাণ চোখে পড়ে। মাথার ওপর শেকল দিয়ে ঝোলানো সাদা শেড্ পরানো বড় বাতি জ্বলছে, আলোর রঙ বাদামী; এই ঢাকা জায়গা—অনেকটা যেন লবির মতন, দু পাশেই বড় বড় সেটি পাতা রয়েছে বসার জন্যে, এক কোণে হ্যাট্ স্ট্যান্ড, আয়না, দেওয়ালে গোটা দুয়েক বিশাল বিশাল ছবি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের, একটা চমৎকার হরিণের মাথা।

সমস্ত বাড়ি কিন্তু কী চুপচাপ। দোতলা থেকে পাতলা স্বর ভেসে আসছিল সামান্য।

লোকটি ফিরে এল। এসে বলল, "আসুন আপনারা।"

খুবই আশ্চর্য ডান বা বাঁ দিকের মুখোমুখি দুটো বাইরের ঘরের কোনোটাতেই ওদের নিয়ে গিয়ে বসালো না লোকটি। একটু ভেতর দিকের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলল। বলে চলে গেল।

সেকেলে কাঠের গদি-আঁটা চেয়ারে বসল তারা-পদরা। এই ঘরটা সামান্য ছোট। ঘরের বারো আনা শুধু বইয়ে ভরতি। মোটা মোটা বই। বোধ হয় আইনের বই। একদিকে দেওয়ালে-গাঁথা সিন্দুক। লোহার একটা আলমারি অন্যদিকে। জানলা বরাবর বোধ হয় দত্ত-মশাইয়ের বসার জায়গা, সিংহাসনের মতন

চেয়ার, সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল।

এই ঘরের গন্ধই যেন কেমন আলাদা। বইপত্রের জন্যেই বোধ হয় ধুলো-ধুলো গন্ধ লাগে নাকে। পায়ের তলায় জুট কার্পেট। দেওয়ালের দু-এক জায়গায় ছোপ লেগেছে। ঘরে মস্ত বড় একটা পোট্রেট ঝোলানো, কোনো বৃদ্ধের, দত্ত-মশাইয়ের বাবা কিংবা ঠারকুদার। এক দিকে নীচু টেবিলের ওপর একটা বেড়াল। জ্যান্ত নয়, মরা। কেমন করে তৈরী করেছে কে জানে! একেবারে জ্যান্ত বলে মনে হয়। গায়ের লোম, চোখের মণি, কান, পায়ের থাবা সব যেন জীবন্ত। বেড়ালের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। চোখে খুব যে ভাল লাগে তা কিন্তু নয়।

তারাপদ আর জয়ন্ত নীচু গলায় কথা বলছিল, পায়ের শব্দ শুনে চুপ করে গেল।

ছিপছিপে চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে এলেন। টকটকে গায়ের রঙ, মাথায় বেশ লম্বা, পরিষ্কার করে কামানো মুখ, মাথার চুল একেবারে সাদা ধবধবে, পরনে ধুতি, গায়ে পুরো হাতা পশমী গেঞ্জির ওপর দামী শাল। চোখে চশমা।

তারাপদরা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে জড়সড়ভাবে নমস্কার করল হাত তুলে।

ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন। চশমার আড়াল থেকে দুজনকে লক্ষ করতে করতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন শেষে।

চন্দন ইশারায় তারাপদকে চিঠিটা বের করতে বলল।

তারাপদ চিঠি বের করল।

চিঠি বের করে তারাপদ দু পা এগিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "আজ সকালে আমি এই চিঠিটা পেয়েছি। আপনিই কি আমায় দেখা করতে বলেছিলেন?"

ভদ্রলোক চিঠির জন্যে হাত বাড়ালেন। দেখলেন। বললেন, "আজ সকালে আমি এই চিঠিটা পেয়েছি। আপনিই কি আমায় দেখা করতে বলেছিলেন?"

ভদ্রলোক চিঠির জন্যে হাত বাড়ালেন। দেখলেন। বললেন, "হ্যাঁ, আমারই নাম মৃণালকান্তি দত্ত। বসুন আপনি।"

তারাপদ আবার দু পা পিছিয়ে এসে চন্দনের পাশে বসল।

মৃণাল দত্ত কিছক্ষণ সরাসরি তারাপদদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "আপনার নামই কি তারাপদ?"

তারাপদ একটু কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল। এ আবার কেমন প্রশ্ন? সামান্য যেন রাগই হল। ভাবল, বলে—আজ্ঞে আমি তো তাই জানি।.....কিন্তু মৃণাল দত্তের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলতে তার সাহস হল না। ভদ্রলোকের চেহারায় শুধু ব্যক্তিত্বই নেই, দেখলেই বোঝা যায়, অসম্ভব সাবধানী, চালাক এবং বুদ্ধিমান উনি।

তারাপদ নিজের নাম বলল আবার, পদবী সমেত। বটুকবাবুর মেসের ঠিকানাও।

"আপনার পিতার নাম?"

তারাপদ তার বাবার নাম বলল। তাতেও রেহাই নেই, মার নামও বলতে হল। বাবার নাম মার নামের পর তাদের পৈতৃক দেশবাড়ি ভিটেমাটির কথাও।

তারাপদ বলল, "আমি এ-সব চোখে দেখি নি। ছেলেবেলায় একবার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন আমার চার-পাঁচ বছর বয়েস, আমার কিছু মনে নেই। শুধু একটা তেঁতুল গাছের কথা মনে আছে, খুব বড় তেঁতুল গাছ, গাছটায় নাকি ভূত থাকত....." তারাপদ একটু হাসল।

এমন সময় বাহারী ট্রেয়ের ওপর সুন্দর কাপে করে চা আনল সেই বুড়ো লোকটি। তারাপদদের দিল।

মৃণাল দত্ত বললেন, "চা খাও—", বলেই তাঁর কি খেয়াল হল সামান্য হালকা গলায় বললেন, "তোমাদের তুমি বলছি, কিছু মনে করো না, বয়েস তোমাদের অনেক কম।"

চা পেয়ে তারাপদরা বেঁচে গেল। একে এই বিশ্রী অবস্থা, তার ওপর শীত, হাত-পা রীতিমত ঠাণ্ডা হয়ে আসার যোগাড়।

"ওই ছেলেটি তোমার বন্ধু?" মৃণাল দত্ত চন্দনকে দেখিয়ে তারাপদকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার পুরোনো বন্ধু। ওর নাম চন্দন। ডাক্তারী পাশ করেছে সবে।"

মৃণাল দত্ত চন্দনকে দু চারটে কথা জিজ্ঞেস করলেন, পুরো নাম কি চন্দনের, কোথায় থাকে, বাড়ি কোথায়, বাবা কি করেন, কোথায় থাকেন—এই সব।

শেষে মৃণাল দত্ত তারাপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমায় এবার ক'টা কথা জিজ্ঞেস করবো। ঠিকঠিক জবাব দিও। তোমার বন্ধু এখন এখানে থাকতে পারে —পরে তাকে একটু উঠে যেতে হবে।"

তারাপদ একবার চন্দনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মৃণালবাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "চাঁদু আমার পুরোনো বন্ধু। ওর কাছে আমার কিছু গোপন করার নেই। ও আমার সবই জানে।"

"আচ্ছা, সে আমি পরে ভেবে দেখব। এখন তোমার বন্ধু থাকুক।" বলে মৃণাল দত্ত যেন সামান্য কি ভেবে নিলেন।

খুবই আচমকা মৃণাল দত্ত বললেন, "তুমি ভুজঙ্গ-বাবুকে কখনো দেখেছ?"

"আজ্ঞে, না।"

"তাঁর নাম শুনেছ?"

"আমার মনে পড়ছে না। মার কাছে আমার এক পিসিমার কথা শুনেছি। পিসিমার শ্বশুরবাড়ির পদবী ছিল হাজরা। সাঁওতাল পরগণার কোথায় যেন থাকতেন—জায়গাটার নাম আমি জানি না। মা যদি বলেও থাকে—আমি ভুলে গিয়েছি।"

মৃণাল দত্ত খুব শান্তভাবে বসে, তারাপদর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার বাবা কবে মারা যান?"

"বাবা—!...বাবা মারা গেছেন অনেক দিন। আমি তখন স্কুলে পড়ি। ক্লাস এইট্-এ।"

"অসুখ করেছিল? কি অসুখ?"

"কি অসুখ আমি বলতে পারব না।.....বাবা কলকাতার বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলেন। অসুখ নিয়ে ফিরে আসেন। কয়েক দিনের মধ্যে মারা যান।

"কোথায় গিয়েছিলেন জানো না?"

"না।"

"মার কাছে কিছু শুনেছ?"

"না।...বাবা যখন ফিরে আসেন তিনি কেমন যেন

হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকটা পাগলের মতন। অথচ একটা কথাও বলতেন না। বলতে পারতেন না। একেবারে বোবা। মাথায়ও কিছু হয়েছিল, মনে হত আমাদের চিনতেও পারছেন না।" বলতে বলতে তারাপদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এতকাল পরে বাবার কথা মনে হওয়ায় হঠাৎ যেন সেই পুরোনো স্মৃতি তাকে কেমন বিষণ্ণ করে তুলল।

মৃণাল দত্ত নীরব। চন্দন আড় চোখে একবার কালো বেড়ালটার দিকে তাকাল। তার চোখের মণিতে আলো পড়েছে যেন।

"তোমার মা কবে মারা যান?" মৃণাল দত্ত শুধোলেন।

"আমি কলেজ থেকে বেরুবার পর মা মারা যায়। বাবা মারা যাবার পর মা অনেক কষ্টে স্কুলে একটা চাকরি জুটিয়ে নেয়। আমরা বরাবরই খুব গরীব-ভাবে থেকেছি। কোনো রকমে চলত দু-জনের। মার বুকের অসুখ করেছিল। তাতেই মারা যায়।"

মৃণাল দত্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর রাখা চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিলেন। "তোমরা আগে কোথায় থাকতে, ঠিকানা কি?"

তারাপদ মদন দত্ত লেনের ঠিকানা বলল।

"তারপর?"

তারাপদ বটুকবাবুর মেসে এসে ওঠার আগে যেখানে যেখানে ছিল তার কথা বলল।

চুরুট ধরিয়ে নিয়ে মৃণাল দত্ত এবার বললেন, "তোমার পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণ তোমায় তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি—স্থাবর অস্থাবর—সবই দিয়ে যেতে চান। ভুজঙ্গবাবুর প্রপারটি যা যা আছে তার সঠিক ভ্যালুয়েশান আমি এখনই দিতে পারব না। ধরো মোটামুটি দেড় থেকে পৌনে দু লাখ টাকার। এ-সমস্তই তোমার হবে। কিন্তু..."

তারাপদর মাথা প্রায় ঘুরে উঠল। দেড় লাখ টাকার সম্পত্তি। আজ সকালে দাঁত মাজার পেস্ট পর্যন্ত যার ছিল না, বটুকবাবুর তিরিশটা টাকার জন্যে যার আত্মহত্যা করার ইচ্ছে করছিল, সেই লোক সন্ধ্যেবেলায় দেড় লাখ টাকার সম্পত্তি পাচ্ছে। তারাপদর ইচ্ছে করছিল—থিয়েটারের লোকদের মতন হাহা করে হেসে ওঠে।

মৃণাল দত্ত বললেন, "কিন্তু এই সম্পত্তি পাবার আগে তোমায় দুটো শর্ত পালন করতে হবে।"

তারাপদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

মৃণাল দত্ত বললেন, "তুমিই যে ভুজঙ্গবাবুর আত্মীয় তারাপদ তা প্রমাণ করতে হবে।"

"কি করে করব?"

"তোমার যা করার করেছ, বাকিটা আমি করব। আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমি মিলিয়ে দেখব। তার আগে তোমার বন্ধুকে এ-ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে উঠে যেতে হবে।"

তারাপদ কিছু বলার আগেই চন্দন উঠে দাঁড়াল। সেও রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছিল।

তারাপদ বলল, "আর-একটা শর্ত কি?"

মৃণাল দত্ত শান্ত গলায় বললেন, "প্রথমটা যদি মেলে তবে না দ্বিতীয়টা।"

চন্দন আর-একবার বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কোটের হাতায় বোতাম থাকে কেন?

ছেলেরা কোট পরে কিন্তু তাদের হাতায় তিন চারটে বোতাম থাকে কেন—কেউ কি তা জানে? সবাই বলবে, ও তো নিয়ম, ফ্যাশন। কিন্তু ফ্যাশন বা নিয়মটা চালু হল কি করে? প্রথমে ধরা যেতে পারে, আগেকার কালে কোট হত বেজায় লম্বা আর ঢোলা। হাতাগুলো ঝলমল করত। সবটাই তখন কোটের আমি, কোটের তুমি। হাত বের করবার জন্যে কোটের হাতাকে বোতাম দিয়ে বেঁধে রাখতে হত। কিন্তু এ-ছাড়াও কোটের হাতায় বোতাম এলো কি করে তার একটি গল্প আছে। প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর সেনাবাহিনী থেকে এই গল্পের উৎপত্তি। রাজা ফ্রেডারিক ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিলেন। তাঁর সেনাদলের পোশাকআশাক ঠিক-ঠাক পরিষ্কার না থাকলে তিনি বেজায় চটে যেতেন। তিনি দেখলেন, সৈন্যদের অনেকের ভারি বিশ্রী বদভ্যাস আছে। কোটের হাতায় তারা যখন-তখন মুখের ঘাম মোছে। তাতে হাতাগুলো শীগ্‌গিরই নোংরা, ঘেমো হয়ে যায়। আর সৈন্যদের দেখায় খুব বোকা বোকা। তাই রাজা এক পরোয়ানা জারি করলেন। এরপর থেকে সৈন্যদের কোটের হাতার ওপর পাশে সার সার বোতাম বসবে। তাহলে সৈন্যরা কোটের হাতায় ঘাম মুছে আর সুখ পাবে না। মুছতে গেলেই মুখ ছড়ে যাবে। এই করে রাজা ফ্রেডারিক তাঁর সৈন্যদের নোংরা অভ্যাস ছাড়ালেন। কিন্তু বোতাম আর কোটের হাতাকে ছাড়ল না। নানা সময়ে নানা জায়গা ঘুরে ফিরে বোতাম এখন এসে বসেছে কোটের হাতার তলার দিকে। কোটের হাতা থাকলেই বোতাম থাকতে হবে, এটা এখন ধরা-বাঁধা নিয়ম। স্টাইলও বটে।

রাত গভীর

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দোষ আমারই। বন্ধুর বোনের বিয়ে। যাব আর খেয়ে চলে আসব, এই ঠিক ছিল। কিন্তু গিয়েই মুস্কিলে পড়লাম।

বন্ধু একান্তে ডেকে হাত দুটো ধরে বলল, উদ্ধার করে দে ভাই, ভীষণ বিপদে পড়েছি।

কি আবার হ'ল?

পাড়ার ছেলের দল পরিবেষণ করবে ঠিক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একদল বেপাড়ার জলসা শুনতে চলে গেছে। লোক কম। তোদের হাত লাগাতে হবে।

ঠিক আছে।

পাঞ্জাবি খুলে ফেললাম। তারপর কোমরে গামছা বেঁধে লেগে গেলাম কাজে।

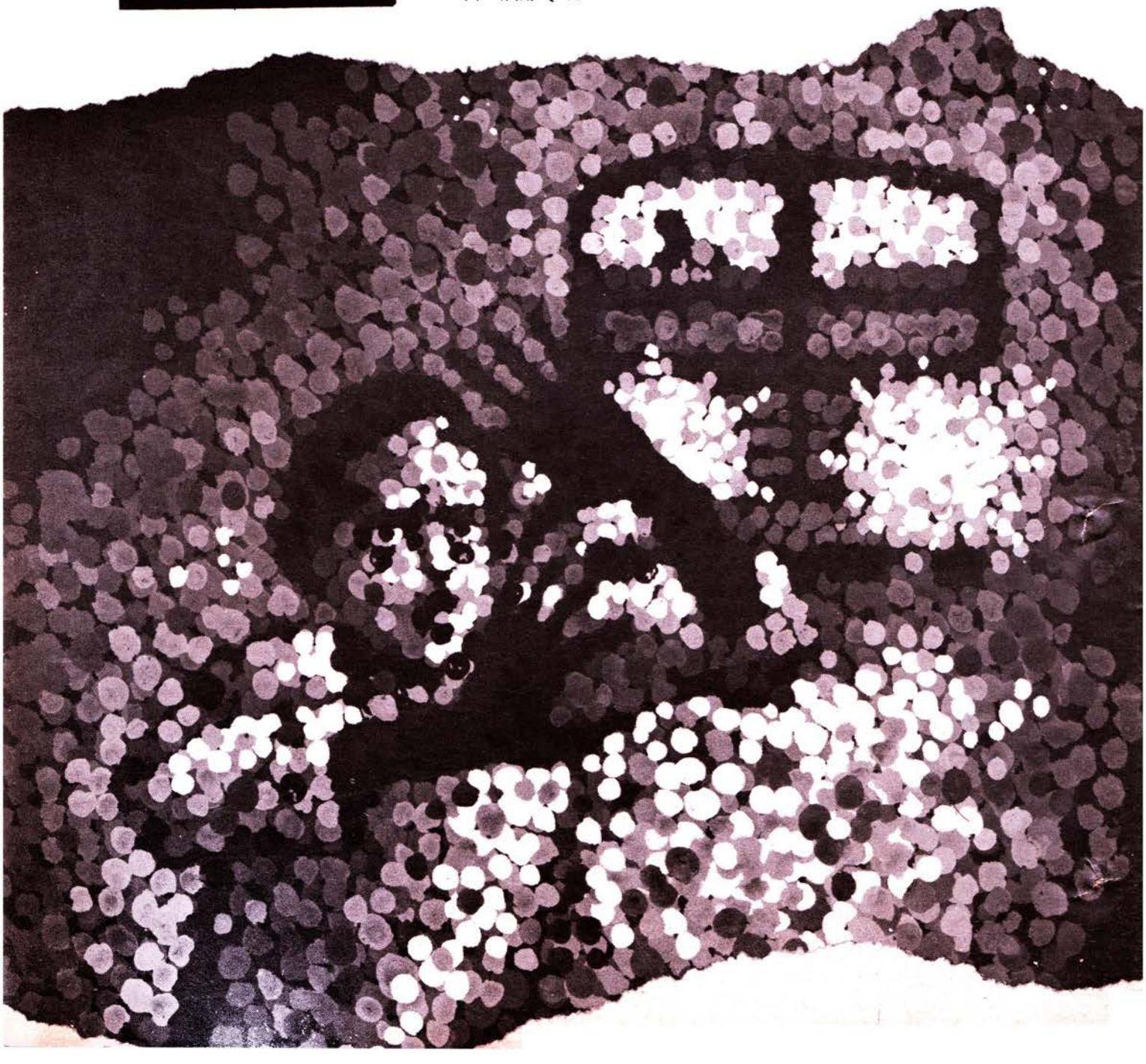

সব যখন শেষ হ'ল, রাত বারোটা বেজে গেছে। নিজের আর কিছু মুখে দেবার ইচ্ছা ছিল না। একটু দই খেয়ে রাস্তায় যখন পা দিলাম তখন সাড়ে বারোটা।

বন্ধু বলেছিল নিমন্ত্রিতদের কারও মোটরে উঠিয়ে দেবে, কিন্তু রাস্তায় নেমে দেখা গেল, সবাই চলে গেছে। কোন মোটর নেই।

বন্ধুকে আশ্বাস দিলাম, আমি বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব। সাড়ে বারোটা কলকাতার পক্ষে আর এমন কি রাত।

রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলাম, এদিক ওদিক দু'দিক ফাঁকা। যানবাহন তো নেইই, রাস্তা জনমানবশূন্য।

বরাত। আচমকা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হ'ল। বিরক্তিকর। বৃষ্টির ফাঁকে রাস্তার আলোগুলো বেশ নির্জীব, নিষ্প্রভ। পিছিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়াতে গিয়েই বিপত্তি।

একটা কালো কুকুর শুয়েছিল। দেখতে না পেয়ে একেবারে তার পেটের ওপর পা চাপিয়ে দিতেই কুকুরটা বিকট স্বরে চীৎকার করে উঠল।

গেছি রে বাবা! লাফিয়ে রাস্তার কাছে আসতেই চোখে পড়ে গেল।

অনেক দূর থেকে একজোড়া আলো এগিয়ে আসছে।

মরিয়া হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। বাস, লরি, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি যাই হোক না কেন, দু' হাত তুলে থামাব।

তা না হলে সারাটা রাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কিংবা পিছু হেঁটে নিমন্ত্রণবাড়ি গিয়ে বন্ধুকে ঘুম থেকে তুলে বিব্রত করতে হবে।

আলো দুটো খুব ধীরে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হল, বুঝি বা থেমেই আছে। আর এদিকে আসবেই না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সবে ভিজে মাথাটা মুছে নিচ্ছি, আচমকা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

কি মশাই, রাস্তার মাঝখানে নট-রাজনৃত্য দেখাচ্ছেন নাকি? তারপর চাপা দিলেই চটে যাবেন।

তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে সরে এসেই লক্ষ্য করলাম, একটা মিনিবাস। দূরের আলোজোড়াও আর দেখা গেল না।

তার মানে দূরের আলোদুটো এই মিনিবাসেরই। হঠাৎ খুব দ্রুত এসে পড়েছে।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি উঠব।

মিনিবাস থামল। হাতল ধরে উঠে পড়লাম। মিনিবাস একেবারে ফাঁকা। অবশ্য এই মাঝরাতেরও পরে যাত্রী আর পাবে কোথায়। পিছনের সীটে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

মাথাটা ভাল করে মোছা হয়নি। কোঁচার খুঁট খুলে জোরে জোরে মুছে নিলাম। আমার আবার সর্দির ধাত। মাথায় জল বসলেই বেদম কাশি শুরু হবে।

উঃ। মনে হল, হাতের ওপর কে যেন বরফের টুকরো চেপে ধরেছে।

মুখ তুলে দেখলাম, একটা ছোকরা আমার হাতে টোকা দিচ্ছে।

দাদা, টিকেটটা করবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকুরিয়া যাবে তো?

হ্যাঁ যাবে। যেতেই হবে।

কত ভাড়া?

তিন টাকা।

তিন টাকা? নব্বই পয়সা করে যাই যে।

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম ঠিক বলিনি। দিনের বেলা যা রেট, এই মাঝরাতে দুর্যোগে সে রেট কখনও হতে পারে! বাড়তি পয়সা বোধ হয় ড্রাইভার কন্ডাকটারের পকেটে যাবে।

কোন কথা না বলে তিনটে টাকা এগিয়ে দিলাম।

টিকেট দিতে দিতে লোকটা বলল, এ মিনিবাসে যেখানে যাবেন এক ভাড়া। সামনের স্টপেজে নামলেও ওই তিন টাকা।

লোকটার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা হ'ল না। বলুক যা ইচ্ছা, মাঝরাতে যে পৌঁছে দিচ্ছে, এই আমার ভাগ্য।

সীটে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে দেখলাম। সব ঝাপসা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মিনিবাস খুব জোর ছুটছে। এত রাতে পথিক নেই, ট্র্যাফিক সিগন্যালের বালাই নেই, তাই এই বেপরোয়া গতি।

কিছুক্ষণ পর ঘুমে চোখ বুজে গেল। ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। লোকটা আমি কোথায় নামব জানে। ঢাকুরিয়া এলে ঠিক ডেকে দেবে।

এক সময়ে ঘুম ভাঙল। মিনিবাস একভাবে ছুটছে। চোখ হাতঘড়ির দিকে পড়তেই চমকে উঠলাম। রাত আড়াইটে।

যেভাবে মিনিবাস ছুটছে, এতক্ষণে কখন ঢাকুরিয়া পৌঁছে যাবার কথা।

জিজ্ঞাসা করবার জন্য এদিক ওদিক দেখেই অবাক হলাম। মিনিবাস খালি। কেউ কোথাও নেই।

অ মশাই, শুনছেন, ঠিক রুটে যাচ্ছেন তো। ঢাকুরিয়া পিছনে ফেলে এলেন না কি।

কোন উত্তর নেই।

আশ্চর্য, গেল কোথায় লোকটা!

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন বোধ হয় মিনিবাস থামিয়ে লোকটা নেমে গেছে। কিন্তু এভাবে মাঝ পথে কি নেমে পড়তে পারে।

ঝড়ের বেগে মিনিবাস ছুটেছে। মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে চাকাগুলো যেন রাস্তাই ছুঁচ্ছে না।

ঢাকুরিয়া কখন পার হয়ে গেছে। নীচু হয়ে দেখলাম দুপাশে ঝোপজঙ্গল। জোনাকির বাহার। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে কোথায় চলেছে মিনিবাস?

আমি এগিয়ে একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসলাম। ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বললাম।

দাদা, কোথায় চলেছেন? জায়গাটার নাম কি?

ড্রাইভার পিছনে ফিরল না। গম্ভীর গলায় বলল, আমি বলব কি করে? কন্ডাকটর ঘণ্টা না দিলে আমি বাস থামাই কি করে?

কিন্তু ঘণ্টা দেবে কে? কন্ডাকটর তো কখন নেমে গেছে।

এবার ড্রাইভার পিছন ফিরল।

এই পেঁচী ভূতগুলোর কথা আর বলবেন না মশাই। এই আছে, এই নেই। এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাই ঝকমারি।

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল প্রবাহ। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল থর-থরিয়ে।

মানুষ নয়, নরকঙ্কাল। চোখের দুটো গর্তের মধ্যে লাল আলোর শিখা। কথা বলবার সময় দাঁতগুলো মড় মড় করে উঠল।

গলা দিয়ে ভয়ার্ত স্বর বের হ'ল, আপনি?

আবার ড্রাইভার হেসে উঠল। দু হাতে পাশা নাড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনই আওয়াজ।

আমি? এই দেখুন।

কঙ্কাল-হাত দিয়ে ড্রাইভার একটা পৈতা তুলে ধরল, খানদানী ব্রহ্মদত্যি। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার সঙ্গে ওদের তুলনা। মরেওছি ব্রাহ্মণের হাতে।

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে আবার স্টিয়ারীং-এর দিকে নজর দিল।

কি দাদা, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? টিকেট করেছেন।

পিছন থেকে কন্ডাকটরের কণ্ঠ।

লোকটা হঠাৎ এল কোথা থেকে?

কিন্তু কোথায় লোকটা! সার্ট, প্যান্ট, কাঁধে ব্যাগ সব ঠিক আছে, শুধু লোকের চিহ্ন নেই।

আচ্ছা ভূতুড়ে মিনিবাসে উঠেছি তো। এখন প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

পকেট থেকে টিকেট বের করে দেখালাম। গলায় সাহস এনে বললাম, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

কোথায় থাকব? সীটের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। ঘুম হবার কি আর যো আছে।

তারপর লোকটা পাশে বসল। লোকটা বসল মানে তার জামাকাপড় বসবার ভঙ্গী করল।

আপনাকে কি বলছিল ভৈরব ভটচাজ?

আমি অবাক। দেহ অদৃশ্য, অথচ কণ্ঠস্বর কানে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভৈরব ভটচাজ কে?

ওই যে বাস চালাচ্ছে। বামনাই দেখাচ্ছিল বুঝি? যে আসে তাকেই পৈতা তুলে দেখায়। আজকাল আবার পৈতার কোন মান-সম্মান আছে নাকি? ওর জন্যই তো আমার এই অবস্থা।

কি রকম?

লোকটা ব্যাগটা কাঁধ থেকে কোলের ওপর রাখল। বেশ জুতসই হয়ে যেন বসল।

তারপর বলতে শুরু করল।

স্টিয়ারিং ধরলে ভৈরবের আর জ্ঞান থাকে না। তখন মিনিবাস না উড়ো-জাহাজ কি চালাচ্ছে, ভুলেই যায়। কত-বার সাবধান করেছি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। পাঁচ ছ বছরের বাচ্চা হাতে মুড়ির ঠোঙা, রাস্তা পার হচ্ছিল, দিলে তাকে চাপা। ব্যস, চারদিক থেকে লোক ঘিরে ফেলল। আধলা ইঁটের বৃষ্টি শুরু হ'ল মিনিবাসের ওপর। চায়ের দোকান থেকে এক টিকিওলা বামুন বের হয়ে এল, হাতে লোহার রড, একে-বারে সোজা ভৈরবের মাথায়। আর শব্দটি করতে হল না। স্টিয়ারিং-এর ওপর নেতিয়ে পড়ল। আমি দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম, থান ইট এসে লাগল আমার চোয়ালে। বাপ্ বলে ডিগবাজী খেয়ে রাস্তার ওপর পড়লাম। সেই থেকে এই অবস্থা। ভৈরব বামুনের হাতে গেছে, নিজে বামুন, তাই ব্রহ্ম-দৈত্য। আর আমি—

কথা আর শেষ হ'ল না।

ভৈরব ভটচাজ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, দেখ গুপে, প্যাসেঞ্জারকে যা তা বোঝাস নি। তুইই তো বললি, সব ঠিক আছে, চালাও জোরে। বাবুদের অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

খবরদার, কপালের নীচে অমন ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ রয়েছে কিসের জন্য? রাস্তার লোকজন দেখতে পাও না? আমি বলব, তবে থামবে?

এবারে ওদের চেহারা দেখা গেল। চেহারা মানে কঙ্কাল।

চেঁচামেচি, হৈ চৈ, শেষকালে হাতাহাতি।

সর্বনাশ, ভৈরব ভটচাজ স্টিয়ারিং ছেড়ে বাসের ভিতরে হাত বাড়াল।

আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন! একবার ইঁটের ঘায়ে কাবার হয়েছিস, এবার আমার হাতে মরবি।

গুপেও আস্তিন গুটিয়ে রুখে দাঁড়াল।

আঙ্গুলের হাড়গুলো মড় মড় করে উঠল। ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাসের মেঝের ওপর।

বেশ, হয়ে যাক। দাদা বলে এতদিন কিছু বলিনি, কিন্তু আর মানুষ নই যে মিথ্যা কথা সহ্য করব, অপমান গায়ে মাখব না। দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি।

আমি মহা মুস্কিলে পড়লাম।

দুই কঙ্কালের মাঝখানে আমি। লড়াই হলে বেশীর ভাগ চোট আমার ওপর দিয়েই যাবে।

স্টিয়ারিং ছেড়ে ভৈরব ভটচাজ ভিতরে চলে এসেছে।

স্টিয়ারিং-এ কেউ নেই, অথচ ভূতুড়ে বাস উদ্দামবেগে ছুটেছে। বুঝতে পারলাম, এখনই আশপাশের দোকানের সঙ্গে কলিশন হবে। মিনি-বাস চুরমার, সেই সঙ্গে আমিও।

অনেকগুলো উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কেউ ভৈরব ভটচাজের পক্ষ সমর্থন করছে, কেউ গুপীর।

কিন্তু বাস তো খালি ছিল, এত-গুলো লোক এল কোথা থেকে।

মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল, বুকের টুক-টুক শব্দ বুঝি বন্ধ হয়ে গেল।

একেবারে সামনের সীটে, আমার পাশে তখন হালদারের দাদামশাই। মাস দুয়েক আগে যিনি বাজার থেকে আসবার সময় বাসের চাকার তলায় একেবারে থেঁৎলে গিয়েছিলেন।

তাঁর পিছনের লোকটিও আমার খুব চেনা। আমার অফিসের দপ্তরী। যে ক'দিন আগে অফিসের সামনে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হবার সময় বাসের তলায় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গিয়েছিল।

আর একজনকে চিনতে পারলাম। আমাদের ঝিয়ের সাত বছরের ছেলে রতন। সেও মারা গেছে বাসের চাকায়।

বাকি লোকগুলোকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে রক্তমাংসের মানুষ কেউ নয়, সবাই কঙ্কাল।

বিকট চিৎকার আর হাড়ের হাত-তালির কানে তালাধরা শব্দ।

লড়ে যা ভৈরব। গুপী দেখি তোর মুরোদ।

আর একদল চেঁচাচ্ছে, সাবাস গুপী, একটা আপার কাট। ভৈরবকে ঠাণ্ডা করে দে।

একবার ভাবলাম, যা থাকে কপালে, বাস থেকে দিই এক লাফ।

কিন্তু ছুটন্ত এই বাস থেকে লাফ দিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তা ছাড়া নামবার জায়গা আটকেই তো যত মারামারি।

হঠাৎ-প্রচণ্ড একটা শব্দ। মনে হল, মিনিবাসটা দু হাতে তুলে কে যেন আছড়ে ফেলল।

হাড়ের খটাখট, কলকব্জার ঝন-ঝনাৎ, সব লোকগুলো বুঝি তালগোল পাকিয়ে গেল।

আমি বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি না। জ্ঞান হ'তে ব্যাঙের কর্কশ ঐক্যতান কানে এল। বুঝতে পারলাম, পুকুরের ধারে পড়ে আছি।

নরম মাটিতে পড়েছি বলে তেমন আঘাত পাইনি। দেহের কোথায় চোট লেগেছে হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

একতিল মাংস কোথাও নেই, কেবল হাড় আর হাড়। স্বপ্ন দেখছি নাকি! চোখে হাত দিতেই হাত ভিতরে ঢুকে গেল। চোখ নেই, বিরাট দুটি গর্ত।

অনেক কষ্টে কঙ্কাল দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

ম্যাজিক যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

তোমরা নিশ্চয়ই শুনে খুশী হবে –এবার থেকে প্রতিবারই আমি আনন্দ-মেলার এই পাতায় তোমাদের জন্য একটা করে ম্যাজিকের কৌশল প্রকাশ করবো। এই ম্যাজিকগুলো তোমরা অভ্যাস করে বন্ধু-বান্ধবদের দেখিও—দেখবে তারা কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাজিকের মধ্যে কৌশলটাই কিন্তু আসল ব্যাপার নয়। এর সাফল্য নির্ভর করছে দেখানোর কায়দার ওপর। আমি যেভাবে তোমাদের শেখাচ্ছি সেটা যদি তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় তাহলে তোমরা একটু ঘুরিয়ে তোমাদের মতো করে দেখিও। মনে রাখবে—যতো সহজ সরলভাবে ম্যাজিক দেখানো যায়—দর্শকেরা ততই মন্ত্রমুগ্ধ হন। আর তাছাড়া—ম্যাজিক ঠিক মতো অভ্যাস না করে দেখানো উচিত নয়। সুতরাং বার বার অভ্যাস করে সহজভাবে তোমাদের বন্ধুদের দেখিও। আমার বাবা বলতেন—ম্যাজিকের সাফল্য নির্ভর করছে তিনটে জিনিসের ওপর : প্রথমটা হচ্ছে—'অভ্যাস করা', দ্বিতীয়টা হচ্ছে 'ঠিকমতো অভ্যাস করা'—আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে দরকারী কথা হলো 'আবার অভ্যাস করা। কথাটার মানে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো—এক কথায়—ম্যাজিক করতে গেলে বারবার অভ্যাস করতে হয়।

আজ তোমাদের যে ম্যাজিকটা শেখাবো– সেটা খুব সহজ এবং মজার। তোমরা খুব সহজেই এটাকে আয়ত্ত করতে পারবে। আচ্ছা—প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। খেলাটার নাম হচ্ছে 'পাঁচ পয়সাকে দশ পয়সা করা।' যাদুকরের হাতে একটা সাধারণ পাঁচ পয়সার মুদ্রা রয়েছে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর নির্দেশক আঙুলের মধ্যে পয়সাটাকে ধরে রাখা আছে। যাদুকরের দুহাতই খালি। ঐ পাঁচ পয়সাটা ছাড়া আর কিছুই নেই।

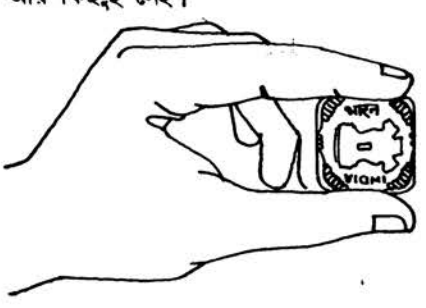

যাদুকর ঐ পয়সাটাকে একটু ঝাঁকালেন—অবাক কাণ্ড— চোখের সামনেই সেটা দশ-পয়সার মুদ্রা হয়ে গেল। যাদুকর পয়সাটাকে আঙুলের ফাঁকে রেখেই উল্টে দেখালেন—পয়সাটার পেছনে ছাপও আছে দশ পয়সার। সবাই অবাক।

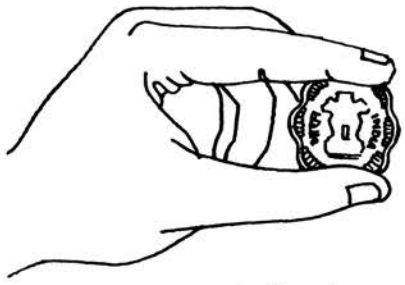

তোমরা ভাবছ—এটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন। অনেক কারসাজী করতে হবে এটার পেছনে। আসলে কিন্তু এটা ভীষণ সহজ ম্যাজিক। এর জন্য একটা ছোট্ট প্রস্তুতি চাই। একটা দশ পয়সার মুদ্রা হাতে নাও। নতুন দশ পয়সার যে হালকা মুদ্রা বেরিয়েছে সেটা নয়—পুরোন দশ নয়াপয়সার মুদ্রার কথা বলছি। গুনে দেখো ঐ পয়সাটার চার পাশে মোট আটখানা বাঁক আছে। তোমাকে করতে হবে কি—ঐ বাঁকের যে কোনও একটা বাঁককে ফাইল দিয়ে ঘষে সমান করে ফেল আর তারপর সেই বাঁকটার ঠিক উল্টোদিকের বাঁকটাকেও ঘষে ঘষে সমান করে ফেলতে হবে। আমি কি বলতে চাইছি তা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

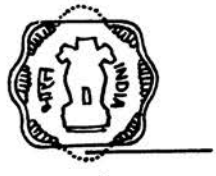

ব্যাস্ এবার ম্যাজিকের সরঞ্জাম তৈরী। এখন অভ্যাস করবার পালা। ১নং ছবি অনুযায়ী এই বিশেষ মুদ্রাটাকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর নির্দেশক আঙুলের মাঝখানে ধরো। ঘষা ধারদুটো দুধারে রইলো। বন্ধুদের জিজ্ঞেস করো—কি দেখছে তারা। সবাই বলবে পাঁচ পয়সা।

এবার আঙুল দুটো ধরা অবস্থাতেই পয়সাটাকে একটু পাক খাইয়ে ঘষা দিকটা ধরো। দেখবে এবার মনে হচ্ছে হাতে সেটা দশ পয়সা হয়ে গেল।

আচ্ছা বল তো!

প্রঃ মাটিতে পড়ে গেলে ঘড়ি থেমে যায় কেন?

উঃ মাটি ফুঁড়ে যেতে পারে না বলে॥

প্রঃ কখন ছাঁকনিতে করে জল আনা যায়?

উঃ জলটা যখন জমে যায়॥

প্রঃ মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র কি?
উঃ 'ক'॥

প্রঃ ইঞ্জিনের কান কারা?
উঃ ইঞ্জিনিয়াররা॥ (ইঞ্জিন + ইয়ার)

প্রঃ একটা গর্ত তিন মিটার লম্বা, তিন মিটার চওড়া, তিন মিটার গভীর। তার থেকে কি পরিমাণ মাটি উঠবে?

উঃ একটুও না। কারণ গর্ত থেকে আবার মাটি তুলবে কি। আগেই তো গর্ত হয়ে গেছে॥

প্রঃ চারজন লোক জলে পড়ে গেল। তিনজনের চুল ভিজল, একজনের ভিজল না। কেন?

উঃ কারণ, চতুর্থ জনের মাথায় টাক॥

প্রঃ দশ মিটার উঁচু দেওয়ালের চেয়ে উঁচু কি কেউ লাফাতে পারে?

উঃ নিশ্চয়ই পারে। দেওয়াল কি কখনো লাফায় নাকি?

শেষদান

অসিত গুপ্ত

বিন্ধ্য অরণ্যে শবরেরা থাকত। আর বনেরধারে ছিল একটি আশ্রম।

কুমার হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য সেই বনের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে। গাছপালার ফাঁক থেকে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। হর্ষবর্ধনের পেছনে ছাতা ধরে যাচ্ছিল আরেকজন ঘোড়-সওয়ার। তারও পেছনে কিছু সৈন্য-সামন্ত।

হর্ষবর্ধন বললেন, 'ছাতা বন্ধ করে দাও। আর দরকার নেই।'

ঘোড়সওয়ার ছাতা বন্ধ করল। ছাতার নাম আভোগ; দামী ছাতা। এর সঙ্গে খাবারদাবার আরও জিনিসপত্র সব পাঠিয়েছেন প্রাগ্ জ্যোতিষের রাজা ভাস্করবর্মন। তাঁর দূত হংসবেগ আগেই এসব দিয়ে গেছে। তারা সকলেই জানে, কুমার হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য আজ কত-দিন হল শুধু বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সেই সময় বনের আরেক ধার দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এলো ব্যাঘ্রকেতু। হর্ষবর্ধনের সামন্ত রাজা শরভকেতুর ছেলে সে। তার সঙ্গে কালো একটি লোক, চৌশিঙ্গা হরিণের ছাল গায়ে, মাথায় লাল ফেট্টি। কাঁধে তীর ধনুক; হাতে বল্লম।

শরভকেতু নমস্কার করে বলল, 'যুবরাজ, আমি এই লোকটিকে এনেছি।'

শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তাঁর ঢালের মতো চওড়া কপালে ঘাম। কাজল – রেখার মতো টানা চোখ; চোখ দুটি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। শাঁখের মতো তাঁর কান আর কি ধারাল নাক!

শিলাদিত্য বললেন, 'এ কে? কি করবে?'

'প্রভু, এর নাম নির্ঘাত। শবর সেনাপতি ভূকম্পের ভাগ্নে। এই বনের প্রতিটি পাতা এর চেনা। আপনি তো জানেন, ভূকম্প এদের সকলকার মোড়ল।'

হর্ষবর্ধন তখন জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা নির্ঘাত, তুমি কাউকে দেখেছ এখানে? সুন্দর দেখতে, অসম্ভব তেজ, মহীয়সী মেয়ে সে। এমন কাউকে দেখেছ?'

নির্ঘাত বলল, 'প্রভু, এই বন আমাদের হাতের পাঁচটা আঙুল। এখান থেকে একটা টিয়া সরে গেলেও আমরা জানতে পারি। আপনি যা বলছেন, তেমন কোন মহীয়সী মেয়েকে তো আমরা দেখিনি। তবে...' এই বলে সে নিজের দৃষ্টি তীরের মতো দূরে ছুঁড়ল, বনের আরেকদিকে।

'তবে?' হর্ষবর্ধন ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলেন।

'বনের ওইদিকে একটি আশ্রম আছে। সেখানে এক ভদন্ত সন্ন্যাসী থাকেন। নাম, দিবাকর মিত্র। তাঁকে জিগ্যেস করলে খোঁজখবর পেতে পারেন।'

দিবাকর মিত্রের আশ্রম দেখে শিলাদিত্যের চোখ জুড়িয়ে গেল। শান্ত, নিরিবিলি জায়গায় পরিষ্কার, ঝকঝকে আশ্রম। বিকেলের আলোয় গৌরবর্ণ এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। যাঁকে ঘিরে ভাগবত, শ্বেতাম্বর জৈন প্রভৃতি নানা ধরনের শিষ্য। মন দিয়ে তারা ভদন্তের কাছে শাস্ত্রের আলোচনা শুনছে।

হর্ষবর্ধন লোক-লস্কর বাইরে রেখে, নিজে পায়ে হেঁটে আশ্রমের ভেতর গেলেন। সন্ন্যাসীকে ভক্তিভরে নমস্কার করে বললেন, 'দেখুন, আমি হচ্ছি কুমার হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য। আমার দাদা রাজ্যবর্ধন স্থানেশ্বরের রাজা। আমি আমার বোনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনেছি সে এই বিন্ধ্য অরণ্যের দিকেই এসেছে। আমার বোনের কোন খবর কি আপনাদের জানা আছে? দেখেছেন কোথাও?'

হর্ষবর্ধনের চেহারা দেখেই সন্ন্যাসী বুঝেছিলেন, এ সামান্য লোক নয়। পরিচয় পেয়ে সব বুঝতে পারলেন; দুঃখ পেলেন। 'রাজ্যবর্ধন কত বড় রাজা, কত শক্তিশালী। কুরুক্ষেত্রের খানিক দূরে স্থানেশ্বরে তাঁর রাজত্ব, হূণরা যাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিল। রাজ্যবর্ধন বীরের মতো লড়ে হূণদের হঠিয়ে দেন। এঁদের একমাত্র বোন রাজ্যশ্রীর বিয়ে হয়েছিল মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণের সঙ্গে। কিন্তু তার কপালে সুখ সয়নি। মালবের রাজা দেব গুপ্ত এই তো কিছু-কাল আগে গ্রহবর্মার রাজ্য আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলে। আর রাজ্যশ্রীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখে। রাজ্যবর্ধন ছেড়ে দেননি। ছোট ভাই হর্ষকে তিনি বলেছিলেন, রাজপাট তুমি দেখ। আমি আসছি। এ-অপমানের শোধ তুলতেই হবে। দেবগুপ্তকে তিনি হারিয়েছিলেন কিন্তু বোনকে পাননি। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক, বাংলার কর্ণ-সুবর্ণতে তাঁর রাজধানী। তিনি দেব-গুপ্তের খুব বন্ধু। বন্ধুর হয়ে তিনি যুদ্ধ করলেন রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে। সেই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাস্ত এবং অন্যায়-ভাবে নিহত হয়েছেন।

সন্ন্যাসী হর্ষবর্ধনকে যত্ন করে বসালেন। তাঁর শিষ্যেরা কেউ পা ধোবার জল নিয়ে এলো, কেউ বাতাস করতে লাগল। সন্ন্যাসী বললেন, 'শিলাদিত্য তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু সুলক্ষণা রাজ্য-শ্রীকে তো আমরা দেখিনি। আমার এই আশ্রমে তার কোন খবর পৌঁছোয়নি।'

হর্ষবর্ধন বললেন, 'ভদন্ত, আমি গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিলাম। শুনলাম, আমার বোন নাকি কারাগার থেকে পালিয়ে এই বনের দিকে এসেছে। আমি কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছি, ভদন্ত। গৌড় রাজ্য আমি পৃথিবী থেকে মুছে দেব আর বোনকে আমার যে-করে হোক খুঁজে বের করবই। না পারি তো আগুনে প্রাণ দেব।'

তাঁরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছেন, সেই সময় এক শ্রমণ ছুটতে ছুটতে এলো। সে হাঁপাচ্ছে, ভয়ে তার মুখ শুকনো। এসে কথা বলতে পারল না, কেবলি ঢোক গিলতে লাগল।

সন্ন্যাসী জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কি হয়েছে, বৎস? তুমি অমন করছ কেন?'

শ্রমণটি কেঁদে ফেলল, 'ভদন্ত, এক সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। আমাদের আশ্রমের সীমানার শেষে বনের ধারে একটি মেয়ে চুপি চুপি প্রাণ দিতে যাচ্ছে!'

'সে কি!' সন্ন্যাসী, হর্ষবর্ধন দু'-জনেই চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, প্রভু। খুব রূপ, খুব তেজ

মেয়েটির, বয়সও বেশি নয়। কিন্তু তার বোধহয় অনেক কষ্ট। সেইজন্যে সে নিজের চিতা সাজিয়েছে। আপনি একটু চলুন প্রভু। বলে-কয়ে যদি শান্ত করতে পারেন।'

সন্ন্যাসী এবং তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কুমার হর্ষবর্ধনও গেলেন। তাঁর মন বলছিল, এ মেয়ে রাজ্যশ্রী।

সন্ধ্যের আকাশ, একপাশটা লাল : ধোঁয়া উঠছে। চিতা জ্বলছিল। একটি মেয়ে মাটিতে শুয়ে রয়েছে : তার জ্ঞান নেই। হর্ষবর্ধন কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁর বোন রাজ্যশ্রী। আগুনে ঝাঁপ দেবার আগেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

হর্ষবর্ধন বোনের কাছে বসলেন। হাত দিয়ে তার চোখে, কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলেন। একটু পরে রাজ্যশ্রী চোখ মেলল। ধোঁয়া, আগুন, গোধূলির ছায়া-ছায়া আলো—রাজ্যশ্রী প্রথমটা ঠাহর করতে পারল না। তারপর চোখের সর কেটে গেলে, হর্ষবর্ধনকে চিনতে পারল।

'দাদা, দাদা—' বলে সে হর্ষের গলা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। শিলাদিত্যর চোখও ভিজে আসছিল। কিন্তু তিনি বোনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। রাজ্যশ্রী বলল, 'সবই তো গেছে। এ-জীবনে আমার কাজ কি? তোমরা আমাকে বাঁচালে। আমি এখন থেকে গেরুয়া নেব।'

সন্ন্যাসী দিবাকর তখন বললেন, 'তা কেন করবে মা? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে। তুমি মিথ্যে কষ্ট পেও না। এখন থেকে দাদা-ই তোমার বাবার মতো, তোমার গুরু। ইনি যা বলবেন, তাই করবে। এঁকে পাশে থেকে সাহায্য কর।'

সেই রাতটা ওরা ভদন্তের আশ্রমে রইলেন। পরের দিন বোনকে নিয়ে হর্ষবর্ধন শিবিরে ফিরে গেলেন। গঙ্গার ধারে তাঁর শিবির।

রাজ্যময় হৈ-হৈ পড়ে গেল। কুমার হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য বোন রাজ্যশ্রীকে নিয়ে ফিরছেন। পথে পথে তোরণ হল; প্রজারা সবাই খুশি। হর্ষবর্ধন রাজধানীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে তিনশ হাতি ডেকে উঠল, শুঁড় তুলে নমস্কার করল। অমাত্যেরা বললেন, 'কুমার, এইবার আপনি রাজপদে বসুন।'

হর্ষ বললেন, 'দাঁড়ান, আমি প্রজাদের মত নিয়ে কাজ করব। তার আগে একবার গঙ্গাতীরে যাব।'

'কেন কুমার? সেখানে কি আছে?'

'বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশের মূর্তি আছে। তাঁকে জিগ্যেস করব, আমার কি করা উচিত।'

কলাবন্ত নামকরা নট। অভিনয়ে তার জুড়ি মেলে না। হর্ষবর্ধনের খুব বন্ধু সে; গলায় গলায় ভাব। সে এসে বলল, 'বাপু হর্ষ, রাজা হও, গজ হও। কিন্তু তার আগে খাসা একখানি নাটক নামাও তো। জমিয়ে অভিনয় করি।'

কুমার শিলাদিত্য সংস্কৃতে খুব ভালো নাটক লিখতে পারতেন; তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো। লেখাপড়ায় বরাবর তাঁর ঝোঁক। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত টাকা দিয়ে তিনি সাহায্য করতেন। কত জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিত তাঁর সভায় ছিলেন। হর্ষ বললেন, 'দাঁড়াও। আগে শশাঙ্ককে জব্দ করি। উত্তরাপথে যাই। তারপর সব

হবে। তার আগে আমি ডান হাত দিয়ে খাব না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

প্রধান সেনাপতি ভণ্ডি-কে তিনি আগেই গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে গেলেন উত্তর ভারত জয় করতে। তখন তাঁর সবসুদ্ধ পাঁচ হাজার হাতি, দু' হাজার অশ্বারোহী আর পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ছিল। সিন্ধু নদের পশ্চিম থেকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত তিনি জয় করলেন।

জয়ের জন্যে রাজ্যে উৎসব হল। গরীব দুঃখী, ভিক্ষু, শ্রমণ, সন্ন্যাসীকে দান-ধ্যান করা হল। মঠ, চিকিৎসালয়, যাত্রীশালা তৈরি হল।
সকলে বলল, 'জয় উত্তরাপথ-নাথ হর্ষবর্ধনের জয়।'

নাটক অভিনয় হবে। শিলাদিত্য নিজে সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখেছেন। নাম, 'নাগানন্দ'। জীমূতবাহনের ভূমিকায় তিনি অভিনয়ও করবেন। কলাবন্ত-ই তাঁকে জোর করে নামাচ্ছে। সে বলেছে, 'তুমি নাটক লিখে দিয়েই পার পাবে ভেবেছ? তা হবে না। তুমি আর আমি দু'জনে দুটো বড় চরিত্র নেব। দেখা যাক্, এ-লড়াইয়ে কে হারে আর কে জেতে!

অভিনয়ের মহড়া চলছিল। পাত্র-মিত্র আছে, রাজ্যশ্রী আছেন। এই সময় হর্ষের প্রধান দেহরক্ষী অগ্রধর মহড়া-ঘরের দরজায় মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়াল। শিলাদিত্য জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

অগ্রধর হাত জোড় করে বলল, 'মহারাজ, আপনাকে এ-সময় বিরক্ত করতে চাইছিলাম না। কিন্তু রাজ-প্রাসাদের ফটকে এক বুড়ি খুব হাঙ্গামা বাধিয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা না করে সে কিছুতে নড়বে না।'

'কেন? সে কি বলতে চায়?'

'বুড়ির ছেলেটা বড় পাজি, মহারাজ। বুড়ো বাপ-মাকে সে খেতে পরতে দেয় না। খালি পাশা খেলে, শিকার করে বেড়ায়। বুড়ো-বুড়ির বড় কষ্ট। তাই এসেছে আপনার কাছে নালিশ করতে।'

শিলাদিত্য বললেন, 'খোঁজ নাও। যদি বোঝ, এ-কথা সত্যি তাহলে ছেলেটার নাক কেটে নেবে। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। কোন অন্যায় আমি সইব না।'

এই বলে তিনি অগ্রধরকে বিদায় দিলেন। তারপর কলাবন্ত আর রাজ্যশ্রীকে বললেন, 'রাজ্যে অরাজকতা বাড়ছে। সেদিন শুনলাম, ডাকাতের হাতে এক চীনা ভিক্ষুর সর্বস্ব খোয়া গেছে। এ তো ভালো কথা নয়।'

কলাবন্ত বলল, 'তুমি না হয় বুদ্ধ-বুদ্ধ করে আহার-নিদ্রা ভুলেছ। সকলে তো আর তোমার মতো সাধু হয়ে যায়নি। দেশ থাকলেই চুরি-ডাকাতি অমন হয়ে থাকে। তা শুনলাম, তুমি নাকি গঙ্গাতীরে যাচ্ছ...ফাজিলগড়ে?'

'হ্যাঁ। ইচ্ছে আছে, মহাপণ্ডিত হিউয়েনসাং-এর সঙ্গে একবার দেখা করব। তিনি এখন নালন্দা বিহারে রয়েছেন। কামরূপের কুমার রাজাও সেখানে রয়েছে শুনছি। চীন দেশ সম্পর্কে হিউয়েন-এর সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে। আর, পারলে ফেরার পথে গঙ্গার ধারে এক ধর্ম সম্মিলনী করব।'

এ-কথা শুনে রাজ্যশ্রী খুব খুশি হল। বলল, 'তাহলে বেশ হয়, দাদা। তবে আরো ভালো হয়, যদি গঙ্গার ধারে এক সঙ্ঘারাম তৈরি কর।'

হর্ষবর্ধন কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'করব। আগে পঞ্চভারত জয় শেষ করে নিই।'

হর্ষবর্ধন তিরিশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছিলেন। মাঝে মাঝে শুধু বিশ্রাম নিতেন। কনৌজ, প্রয়াগ, মগধ, উড়িষ্যা, কঙ্গোদ তাঁর অধিকারে এসেছিল। তাঁর হাতের তরোয়াল সব সময় খোলা থাকত; খাপে ভরতেন না। একেবারে যুদ্ধ শেষ করে তিনি বরাবরের মতো তরোয়াল খাপে ভরলেন; জীবনে আর খুললেন না। তখন তাঁর কত সেপাই, হাতি, ঘোড়া। হাতিই ছিল ষাট হাজার, আর এক লক্ষ অশ্বারোহী। গঙ্গার পশ্চিমদিকে মস্ত এক সঙ্ঘারাম তৈরি হল। আর পুব দিকে একশ' ফিট উঁচু এক দুর্গ। মাঝখানে বুদ্ধদেবের সোনার মূর্তি বসল। শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ধনী দরিদ্র সকলকে ডাকলেন। চৈত্র মাস। একুশ দিন ধরে ধর্মমহাসভা আর মহোৎসব হবে। সঙ্ঘারাম থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় পটে আঁকা অসংখ্য সুন্দর-সুন্দর মণ্ডপ। মধ্যে মধ্যে নহবতখানা। সেখানে ভোরের রাগিণী বাজছে।

হাতির পিঠে হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য চলেছেন। তাঁকে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের মতো দেখাচ্ছে। মাঝখানে সোনার বুদ্ধ-মূর্তি। হর্ষবর্ধন নিজে মাথার ওপর চাঁদোয়া ধরে আছেন। বাঁদিকে বসে কুমার রাজা। তিনি চামর দোলাচ্ছেন। আরেকটি হাতিতে রাজ্যশ্রী। বৌদ্ধ ত্রি-রত্নের সম্মানে তিনি সোনা ও রুপোর ছোট ছোট ফুল বিলোচ্ছেন। শোভা-যাত্রার আগে একশ হাতি, পরে একশ হাতি। হাতির পিঠেই গান-বাজনা চলেছে।

গঙ্গায় বুদ্ধমূর্তিকে স্নান করানো হল। যাবার সময় সেই মূর্তি হর্ষবর্ধন নিজে মাথায় করে নিয়ে যাবেন। সেখানে বুদ্ধকে রত্নখচিত বস্ত্র দেওয়া হবে। রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষ। সমস্ত উত্তর ভারত যেন ভেঙে পড়েছে।

এক জায়গায় হর্ষের মনে হল, কিসের যেন জটলা হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন না। অগ্রধরকে জিগ্যেস করলেন, 'কিসের জটলা বল তো?'

অগ্রধর ভালো করে ঠাহর করে বলল, 'মহারাজ, মনে তো হচ্ছে ওরা ব্রাহ্মণ।'

তখন আর কিছু বোঝা গেল না। সভার কাজ, খাওয়াদাওয়া, দুঃখী-আতুরকে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ সব ঠিক-ঠিক হল। রাজ্যশ্রী যেন দশভূজা হয়ে একাই সব করতে লাগলেন।

শেষের দিন সঙ্ঘারামের চাঁদোয়ায় হঠাৎ আগুন ধরে উঠল। শিলাদিত্য দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। পাশে কুমার রাজা, রাজ্যশ্রী, হিউয়েন সাং। হাওয়া পেয়ে আগুন বেড়ে গেল।

হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য সকলকে শুনিয়ে বললেন, 'এ আগুন কেন? আমার পূর্বজন্মের ফল, তাই আমি ভারতবর্ষে রাজত্ব করছি। কিন্তু রাজা হয়ে আমি তো যা সত্যি তাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি বরাবর। মানুষকে সাধ্য-মতো সেবা করেছি, দান করেছি, সম্রাট অশোকের দেখাদেখি এই সঙ্ঘারাম তৈরি করিয়েছি। ধর্মপথে থেকেছি। তবে এ-আগুন কেন? তাহলে নিশ্চয়ই আমার

এত চেষ্টা, যত্নয় কোন ফল হয়নি। তাই যদি হয়, তাহলে এ-জীবনে লাভ কি?'

সভায় সাড়া পড়ে গেল। রাজ্যশ্রী বলল, 'তুমি এ কি বলছ দাদা?'

কুমার রাজা হর্ষকে বললেন, 'মহারাজ আপনি বিচলিত হবেন না। জল আনছে, এখুনি আগুন নিভে যাবে।'

শিলাদিত্য বললেন, 'না রাজা। আমি যদি কণামাত্র পুণ্য করে থাকি, তাহলে আগুন আপনি নিভবে।'

আগুন হঠাৎ যেমন জ্বলেছিল, তেমনি হঠাৎ নিভে গেল। শিলাদিত্য স্তূপের ওপর উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আর সব রাজারা। এই সময় ভিড়ের মধ্যে 'ধর ধর রব উঠল। হর্ষের সামনে ছিটকেপড়েছে একটি লোক। তার হাতে খোলা ছুরি। রাজাকে মারবে বলে সে ছুরি তুলেছে।

শিলাদিত্যের শক্তি কম নয়। তিনি লোকটির হাত চেপে ধরলেন, তারপর ঘুরিয়ে বার কয়েক চাড় দিলেন। লোকটির হাত থেকে ছুরি খসে গেল। অগ্রধর এবং অন্য দেহরক্ষীরা ছুটে এলো।

ভিড়ের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠল, 'মহারাজ এক্ষুনি শূলে দিন।'

হর্ষবর্ধন কিন্তু একটুও ব্যস্ত হননি, বিচলিত হননি। হাত তুলে তিনি সকলকে শান্ত হতে বললেন। লোকটিকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আমাকে মারতে চাইছিলে কেন? আমি কি করেছি?'

লোকটি তখন সব কথা স্বীকার করল, বলল, 'মহারাজ, আমি এ-কাজ করতে চাইনি। ব্রাহ্মণরাই আমাকে পাঠিয়েছে।'

ব্রাহ্মণরা? তারা-ই বা এ-কাজ করতে চাইল কেন? আমার কোন অপরাধ হয়েছে?'

'মহারাজ, কি বলব! আপনি নাকি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন নি। শ্রমণদের সঙ্গে অনেক বেশি ভদ্রতা করেছেন, ভালো করে কথা বলেছেন। ধনরাশি ভাগে তাদেরই বেশি পড়েছে। এইজন্যে ব্রাহ্মণরা আপনার ওপর ভীষণ চটে আছে। বহুদিন ধরে তারা এই নিয়ে জটলা করছিল। আজ প্রথমে তারা চাঁদোয়ায় জ্বলন্ত বাণ ছুঁড়েছিল। তারপর আমি গরীব লোক, আমার হাতে টাকা গুঁজে দিল, বলল, আপনাকে মারতে পারলে আরো টাকা দেবে... আরো টাকা। হুজুর, আমি সেই লোভে পড়ে...'

এই বলে লোকটি হর্ষের পায়ের তলায় পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল।

মহারাজ হর্ষ লোকটিকে টাকা, কাপড় দিয়ে ছেড়ে দিলেন। অমাত্যরা হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'এ কি করছেন মহারাজ? লোকটা পাপী, ও আপনাকে মারতে চেয়েছিল।'

বিকেল হয়ে আসছে। সোনার মতো সূর্যের আলো শিলাদিত্যের মুখে পড়েছে। তিনি ঝলমল করে হাসলেন, বললেন, 'আপনারা প্রকৃত দোষকে চিনুন, প্রকৃত দোষীকে চিনুন। ও সামান্য লোক, ওর টাকার দরকার ছিল...।'

এরপর হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের দান শুরু হল। এক মাস ধরে চলল সেই দান। দূর দূর থেকে সন্ন্যাসী, দুঃখী, দরিদ্র, অনাথ-আতুর, ইতরজন সবাই এলো। ধুলোর মত টাকা, সোনাদানা খরচ হতে লাগল। হর্ষবর্ধন খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেলেন। হাতে কি টাকা রইল, না রইল ভাবলেন না। প্রথমে অনাথ-দরিদ্র, তারপর ইতরজন, তারপর বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন—এইভাবে আলাদা আলাদা ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি ভাগে কুড়ি দিন করে এই দান-কাজ চলল।

দিতে দিতে সব ফুরিয়ে গেল। হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য তখনো থামলেন না। বোন রাজ্যশ্রীকে বললেন, 'আমাকে একটি চীরবাস দাও তো!' এই বলে নিজের গা থেকে রত্নখচিত মূল্যবান রাজপোশাক তিনি খুলে ফেললেন। শেষ দান দেওয়া হয়ে গেল।

হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য হাত জোড় করে দাঁড়ালেন জনতার সামনে। সকলে 'ধন্য ধন্য, সাধু সাধু' বলতে লাগল।

সভার সামনে বসেছিল কলাবন্ত। তার পাশে কবি ময়ূর এবং 'কাদম্বরী'র লেখক সভাকবি বাণভট্ট। বাণ শোণ নদীর কাছে, প্রীতিকূটে নিজের বাড়িতে এতদিন ছিলেন; একটি শক্ত লেখার কাজ শেষ করছিলেন। বিশেষ করে এই ধর্মসভায় যোগ দিতে তিনি এসেছেন।

কলাবন্ত দুর্গের সামনে মণ্ডপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার গম্ভীর ভরাট গলা তুলে বলল, 'রাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য! তুমি আমার বন্ধু। তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য। তোমার মতো রাজা পেয়ে ভারত ধন্য। তুমি নিজের সব দিয়েছ কিন্তু আমরা দেশের লোক তোমাকে কি দিতে পারি? তবু তুমি আমাদের এই সামান্য দানটুকু নাও নিয়ে কৃতার্থ কর।'

এই বলে কলাবন্ত মহাকবি বাণভট্টকে ডাকলেন। বাণ রাজার স্বস্তিপাঠ করলেন। তারপর নিজের লেখা হর্ষচরিত তুলে দিলেন শিলাদিত্যের হাতে।

ছবি এঁকেছেন অলক ভট্টাচার্য

টিনটিন

কাঁকড়া রহস্য

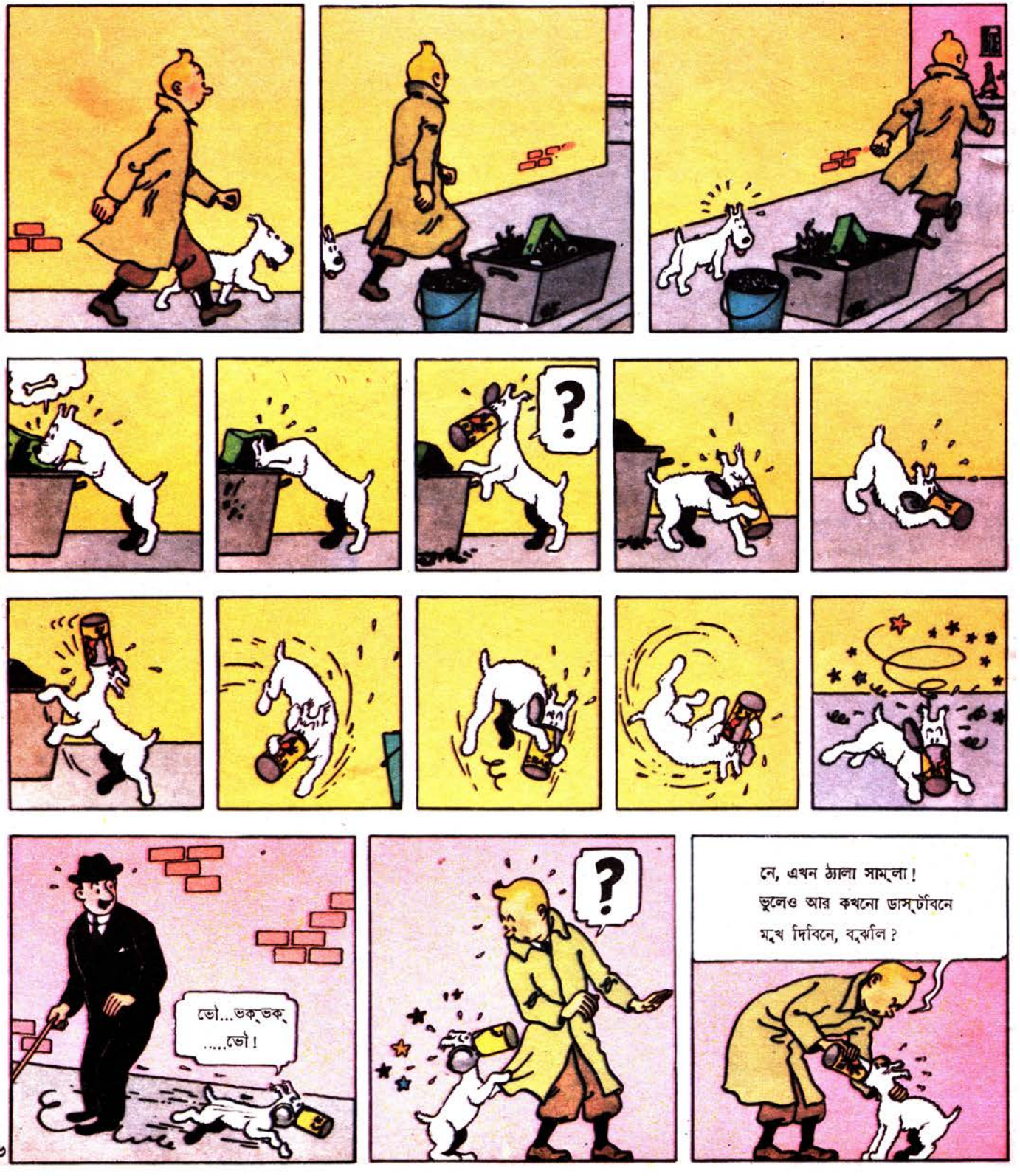

খুব বেঁচে গেছিস! যা ধারালো কৌটো, তোর মুখ যে কেটে যায়নি, ওই ঢের!

ফের যদি দুষ্টুমি করিস কুটুস, তাহলে তোর মুখে একটা ঠুলি পরিয়ে দেব।

আরে, টিন্‌টিন্‌ যে!

OLYMPIA BA

ওয়েটার, আর-একটা লেমোনেড!

আনছি সার্‌

তোমাকে দেখে দারুন ভাল লাগল!

বুঝলে হে, যাকে বলে দারুণ ভাল লাগল!

এই নিন সার্‌!

তাহলে চুমুক দেওয়া যাক!

নিশ্চয় নিশ্চয়!

আমারও আপনাদের দেখে দারুণ ভাল লাগল দাদা!

মাস্টার ফ্রিয়েম

(গ্রিম ভাইদের গল্প)

মাস্টার ফ্রিয়েম মানুষটি রোগা, ছোট্টখাট্ট আর ছটফটে। কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। মুখে তার বসন্তের দাগ, নাকটা লম্বা আর চোখা, চুলগুলো পাক-ধরা আর খোঁচা-খোঁচা, চোখ দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে আর চঞ্চল। কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। সবাইকারই সে খুঁত ধরে। তার ধারণা সবাইকার চেয়ে জ্ঞান তার বেশী আর কখনো ভুল তার হয় না। পথে বেরুলে জোরে-জোরে সে হাত দোলায়। একবার একটি মেয়ে জল নিয়ে যাচ্ছিলো। তার দুলন্ত হাত মেয়েটির গায়ে লাগলে জলের বালতিটা উলটে যায়। ফলে জল ছিটিয়ে পড়ে মেয়েটির সর্বাঙ্গে আর তার নিজের গায়েও। গা ঝাঁকিয়ে জল ঝাড়তে ঝাড়তে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "হাঁদা কোথাকার! তোর পেছন-পেছন যে আসছিলাম সেটা তোর চোখে পড়েনি?"

মাস্টার ফ্রিয়েম ছিলো মুচি। কাজের সময় ছুঁচ সুতো এমন জোরে জোরে সে টানতো যে, কাছে পিঠে কেউ থাকলে মাস্টার ফ্রিয়েমের ঘুঁষি গিয়ে পড়তো তার মুখে। কোনো সাকরেদ তার কাছে এক মাসের বেশী টিঁকতে পারতো না। কারণ, যত নিখুঁতই তার কাজ হোক না কেন সব সময়েই সে খুঁত ধরতো। বলতো—হয় সেলাইয়ের ফোঁড়গুলো সমান হয়নি, জুতোর এক

পাটি অন্যটার চেয়ে লম্বা, নয়তো একটার গোড়ালি অন্যটার চেয়ে উঁচু। সাকরেদদের সে ধমকাতো, "এক মিনিট সবুর কর্, পিটিয়ে তোর চামড়া কি করে লম্বা করতে হয় দেখাচ্ছি।" এই না বলে সাকরেদদের পিঠে সে চাবুক হাঁকাতো।

এক মিনিটও সে স্থির থাকতে পারতো না। ফলে কোনো কাজই সে পারতো না করতে। তার বউ রাত থাকতে উঠে উনুনে আঁচ দিলে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে খালি পায়ে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে সে বলতো; "বলি, বাড়িতে আগুন লাগাবে নাকি? যে-আগুন জ্বালিয়েছো তাতে গোটা একটা ষাঁড় যে ঝলসানো যায়। তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে মনে হচ্ছে কাঠ কিনতে পয়সা লাগে না।"

কাপড় কাচার চাকরানীরা টবের চারপাশে হেসেহেসে গল্প-গুজব করলে তাদের ধমকে সে বলতো, "এ যে দেখছি এক পাল বোকা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। অত সাবান খরচা করছিস কেন? বলি, সাবান কিনতে পয়সা লাগে না? আলসেমির জন্যে তোদের লজ্জা হওয়া উচিত। রগড়াবার নাম নেই—শুধু হিহি-হোহো?" এই না বলে ভীষণ রেগে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে তার পায়ের ধাক্কায় বালতি যেতো উলটে। ফলে জলে ভেসে যেতো ঘরের মেঝে।

একদিন তার বাড়ির উলটো দিকে নতুন একটা বাড়ি তৈরী হবার সময় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে-দেখতে গজগজ করে সে বলে উঠলো, "আবার দেখছি ওরা লাল বেলে-পাথর ব্যবহার করছে! ওটা কখনো ভালো করে শুকোয় না। বাড়িটায় যারা থাকবে তারাই অসুখে পড়বে। আর ছোঁড়াগুলো কি বিশ্রীভাবেই না পাথর গাঁথছে! মাল-মশলাও একেবারে বাজে। চুনের সঙ্গে বালি না দিয়ে পাথরকুচি মেশানো উচিত ছিল। বাড়িটা একদিন না একদিন লোকদের মাথায় হুড়মুড়িয়ে পড়বে।"

তারপর নিজের কাজে বসে কয়েক ফোঁড় দিয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে চামড়ার এপ্রনটা খুলে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "এক্ষুনি ওখানে গিয়ে মজুরদের বাৎলে দিচ্ছি, ভালো করে কাজ করা কাকে বলে।"

ছুতোরদের কাছে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "এ-সবের মানে কি? লাইন বরাবর করাত দিয়ে কাটছিস না যে বড়! পাটাগুলো যে মোটেই সোজা হবেনা।"

এক ছুতোরের হাত থেকে করাতটা ছিনিয়ে তাকে সে দেখাতে যাবে ঠিকমতো কি করে সেটা চালাতে হয়, এমন সময় এক গাড়ি মাটি নিয়ে এক চাষীকে যেতে দেখে করাতটা ছুড়ে ফেলে চাষীর কাছে ছুটে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "তোর কি মাথা খারাপ? এমন ভারি বোঝার গাড়িতে

অমন বাচ্চা ঘোড়াদের কখনো জুততে হয়? এক্ষুনি যে ওরা তোর পায়ের সামনে মুখ থুবড়ে মরবে!"

চাষী কোনো জবাব না দিতে ভীষণ চটে ফ্রিয়েম ছুটে গেলো নিজের কাজের ঘরে।

কাজের জায়গায় যখন বসতে যাবে এক সাকরেদ তার হাতে একপাটি জুতো তুলে দিলো।

সঙ্গে-সঙ্গে হুংকার ছেড়ে সে বললো, "ওটা আবার কি? হাজারবার বলিনি অমন সরু করে কাটতে নেই? ও-রকম জুতো কে কিনবে শুনি? আমি চাই আমার কথা যেন অক্ষরে-অক্ষরে মানা হয়।"

সাকরেদ বললো, "কর্তা, জুতোর গড়ন নিয়ে আপনার আপত্তি হয়তো সত্যি। কিন্তু এ-জুতোটা নিজেই আপনি কেটেছিলেন। এটা নিয়ে করতে-করতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আপনি বাইরে যান। আমি শুধু জুতোটা আপনার হাতে কুড়িয়ে দিয়েছি।"

একরাতে মাস্টার ফ্রিয়েম স্বপ্ন দেখলো, মরে গিয়ে সে স্বর্গে গেছে। স্বর্গে পৌঁছে সেখানকার সিংহদ্বারে জোরে-জোরে ধাক্কা দিয়ে সে বলে উঠলো, "ফটকে ঘণ্টা নেই দেখে অবাক হচ্ছি। এ-ঘরে ধাক্কা দিতে হলে যে আঙুলের গাঁটের ছাল-চামড়া উঠে যাবে!"

কে অমন অধৈর্যের মতো ধাক্কা দিচ্ছে দেখার জন্য সিংহদ্বার খুলে সেণ্ট পিটার বলে উঠলেন, "আরে, মাস্টার ফ্রিয়েম—তুমি? তোমায় আসতে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, সবকিছুর খুঁত ধরার অভ্যেসটা তোমায় ছাড়তে হবে। স্বর্গে ওটা চলবে না।"

ফ্রিয়েম বললো, "কষ্ট করে আমায় সাবধান না করলেও পারতেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বর্গের সবকিছুই নিখুঁত। পৃথিবীর মতো খুঁত ধরার কিছুই এখানে নেই।"

স্বর্গের বড় বড় হলঘরে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে সে দেখে দুই দেবদূত একটা কড়িকাঠ খাড়াখাড়ি ভাবে কাঁধে নিয়ে চলেছে।

মাস্টার ফ্রিয়েম ভাবলো. "কড়িকাঠ এ-ভাবে বইতে হয় নাকি? হাস্যকর ব্যাপার। যাক গে যাক। কোনো কিছুতে ওটা ধাক্কা খাচ্ছে না। এটাই বাঁচোয়া!"

খানিক পরে সে দেখে এক ঝরণায় দুজন দেবদূত বালতিতে জল ভরছে। বালতিটায় ফুটো থাকায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে জল। সে চেঁচিয়ে উঠলো, "এ কি কাণ্ড! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলো, "নিশ্চয়ই ওরা তামাসা করছে। স্বর্গে এ-ভাবে খেলাধুলো করলে ক্ষতি নেই —কারণ, এখানে তো দেখছি লোকদের কাজটজ নেই।"

খানিক যেতে-যেতে সে দেখে পথের গর্তে একটা গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গাড়ির পাশে যে-লোকটি দাঁড়িয়ে-ছিলো ফ্রিয়েম তাকে বললো, "গাড়িতে বেজায় মাল ঠেসেছো। তাই ফ্যাসাদে যে পড়বে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গাড়িটায় কি আছে?"

লোকটি উত্তর দিলো, "নানা সাধু-সংকল্প। সিধে পথে এগুলো আনতে পারিনি। কিন্তু এখানে আমায় চিরকাল আটকে থাকতে দেবদূতরা দেবে না।" তার কথা শেষ হতে-না-হতেই বাস্তবিকই এক দেবদূত এসে গাড়িটায় দুটো ঘোড়া জুতে দিলো।

ফ্রিয়েম বললো, "খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু এ-কাজ দুটো ঘোড়ার কম্ম নয়। চারটে দরকার।"

আরো দুটো ঘোড়া নিয়ে আরো দুজন দেবদূত হাজির হোলো। কিন্তু ঘোড়াদুটোকে গাড়ির সামনে না জুতে, জুতলো পিছনে।

মাস্টার ফ্রিয়েমের আর সহ্য হোলো না। সে চেঁচিয়ে উঠলো, "আরে, করছোটা কি? জীবনে কখনো দেখিনি পেছন থেকে গাড়ি ওপর দিকে টানাতে! তোমাদের দেখি বেজায় হাম-বড়া ভক্ক! ভেবেছো আমার চেয়ে তোমাদের বুদ্ধি ঢের বেশী—তাই না?"

সে আরো অনেক কথা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু এক দেবদূত তার জামার কলার ধরে সজোরে তাকে ছুঁড়ে ফেললো সিংহদ্বারের বাইরে।

আর একবার গাড়িটা দেখার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে মাস্টার ফ্রিয়েম দেখে চারটে পক্ষীরাজ ঘোড়া সেটাকে টেনে তুলছে একটা পাহাড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টার ফ্রিয়েমের ঘুম ভেঙে গেলো। সে বিড়বিড় করে বলে উঠলো, "স্বর্গের অবস্থাও দেখছি মোটমুটি পৃথিবীর মতোই! সেখান-কার অনেক কিছু অবশ্য ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তাই বলে একটা গাড়ির সামনে আর পেছনে ঘোড়া জোতা! এ আবার কি ধরনের আষ্টেলা কাণ্ড? তা ছাড়া ঘোড়াদের যখন চার চারটে পা তখন এক জোড়া করে বাড়তি ডানা দেবার কোনো মানে হয়?—যাক গে যাক! এক্ষুনি উঠে পড়ি। নইলে সবাই মিলে বাড়িটাকে নয়-ছয় করে দেবে। তবে সবচেয়ে সুখের কথা—বাস্তবিকই আমি মরিনি!"

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

তারপর খবর-টবর সব কী?
খবর বলতে, বুঝলে হে, আমাদের ঘাড়ে তো একটা দারুণ কাজ চেপেছে!
মানে?
যাকে বলে দারুণ একটা কাজ!
মানে?
কাগজে এই খবরটা পড়েছ?
"জাল টাকা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকুন!"—হ্যাঁ, পড়েছি বটে।
বুঝলে হে, আমাদেরই উপরে এই নিয়ে তদন্ত করবার ভার পড়েছে।
বটে? কিন্তু...কিন্তু জাল টাকা চেনা তো সহজ নয়!
তোমাদের পক্ষে নয়। কিন্তু আমরা পুলিসের লোক, এক নজরেই আমরা বুঝতে পারি, কোন্‌টা জাল আর কোন্‌টা খাঁটি।
ওয়েটার, কত হল?
তিরিশ পেনি, সার!
এই নাও আধ পাউনড্‌!... হুঁ, যা বলছিলাম, আমাদের নজরই আলাদা।
এটা জাল, সার!
আরে, শেষকালে কিনা আমাকেই জাল-টাকা চালিয়েছে!
এই নাও!
ধন্যবাদ।
তা এই জাল টাকার ব্যাপারে আমরা বিস্তর নথিপত্র জোগাড় করেছি। যদি দেখতে চাও তো আমাদের সঙ্গে এসো।
তা বেশ তো।
আরে, সেই কাগজগুলো তুমি কোথায় রাখলে?
তুমিই তো রেখেছ!
!

A PLACE FOR EVERYTHING AND EVERYTHING IN ITS PLACE

আরে, ওগুলো কী?
ওগুলো পুলিশের সদর-ঘাঁটি থেকে পাঠিয়েছে। সমুদ্রে একটা লাশ ভাসছিল, তার পকেটে ওগুলো পাওয়া গেছে। ওর মধ্যে পাঁচটা জাল আধ-পাউন্ডও ছিল, দ্যাখো। ব্যাপারটা রহস্যময় নয়?

দারুণ রহস্যময়! আমি...আমি...

এক্ষুণি আমি একটা জিনিস দেখে আসছি!
?
?

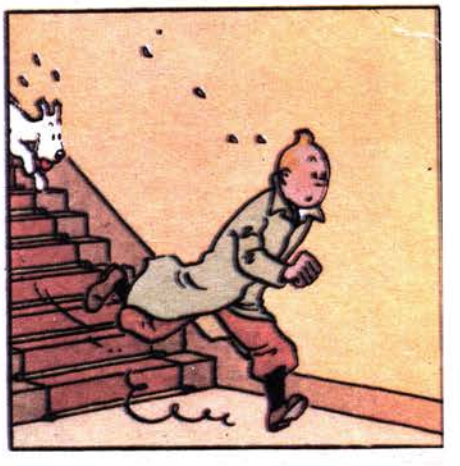

আমিও ওর সঙ্গে যাই!

কী হল টিনটিনের?

আরে, ছড়িটা তো নিয়ে আসিনি!

আরে, ছড়িটা ফেলে গেছে দেখছি!

প্রথম দূত এল আলেকজাণ্ডারের দেশ থেকে

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমরা যে দেশে বাস করি, তার নাম ভারতবর্ষ। বিরাট এই দেশ। এখানে কত রকমের জাতি। কত রকমের ধর্ম। কত নদী আর সমুদ্র। কত পাহাড় আর পর্বত। কত রকমের ভাষা। খুব প্রাচীনকালে পৃথিবীর অল্প যে কটি দেশে সভ্যতার আলো ফুটেছিলো প্রথম, ভারতবর্ষ তার মধ্যে একটি। এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-গরিমার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলো একদিন। একদিন এদেশের মহামানব বুদ্ধের বাণী কান পেতে শুনছে সারা পৃথিবী। এদেশের জাহাজ অন্য দেশে ছুটে গেছে বাণিজ্য করতে। বিদেশে গিয়ে রাজত্বও করেছে এদেশের রাজা রাজড়া। আবার অন্য দেশের রাজা-রাজড়া বা আক্রমণকারীরা অস্ত্র শস্ত্র কামান বন্দুক নিয়ে দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে এসেছে এদেশে। কেউ রাজ্য জয়ের পর সোনাদানা লুটপাট করে গেছে পালিয়ে। কেউ থেকে গিয়ে রাজত্ব করেছে। শত্রুর মত ভাবভঙ্গী নিয়ে কিছুদিন কাটানোর পর ধীরে ধীরে তারা ভালবেসেও ফেলেছে এই দেশের জল মাটি। দেখতে দেখতে এই দেশের জীবনধারার সংগে তারাও মিলে মিশে গেছে আত্মীয়ের মত। এমনি করে তিলে তিলে বড় হয়েছে, বিচিত্র হয়েছে আমাদের এই দেশ।

এই সব শুনতে শুনতে তোমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগতে পারে, অমন আদ্দিকালের পুরনো ইতিহাস এমন নিখুঁত করে আমরা জানলাম কি ভাবে? কেউ বলে দিল? নাকি লেখা ছিল কোথাও? না। এসব কাহিনী জানা যায়নি একদিনে। জোগাড় করতে হয়েছে একটু একটু করে চারদিক থেকে কুড়িয়ে। যে সব জিনিষ থেকে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে প্রাচীন সাহিত্য। যেমন বেদ উপনিষদ। ধর্মশাস্ত্র বা পৌরাণিক কাহিনী। যেমন রামায়ণ আর মহাভারত। পুরনো পুঁথিপত্র, রাজা রাজড়াদের নিজেদের লেখানো জীবনী। প্রাচীন মুদ্রা, সীলমোহর বা টাকা পয়সা। সৌধ, শিলালিপি, স্মৃতি-স্তম্ভ। আবার কখনো কখনো মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে পড়া গ্রাম বা নগর। যেমন বেরিয়ে পড়েছিল সিন্ধু উপত্যকার মহেনজোদড়ো-র। পশ্চিম পাঞ্জাবের হরাপ্পায়।

এসব ছাড়াও ইতিহাসকে জানার আরও একটা উপায় আছে। সেটা হোল বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনা। বিদেশ যাওয়া এমন কিছু কঠিন নয় আজকাল। কিন্তু যখন মাটিতে রেল গাড়ি আর আকাশে এরোপ্লেন ছোটে নি, যখন পৃথিবীতে কোন্ দিকে কোন্ দেশ তাইই জানা ছিল না কারো, তখন এক দেশ থেকে আর এক দেশে বেড়াতে আসা মোটেই সহজ আরামের ছিল না মোটেই। হাজার হাজার মাইল পথ, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ভুল ঠিকানার জাহাজে চেপে ঝড়ে জলে ডুবতে ডুবতে, কখনো মরুভূমি পেরিয়ে, কখনো পাহাড় ডিঙিয়ে এক দেশের মানুষ এসে পৌঁছতো আর এক দেশের মাটিতে। দেখতে, শুনতে, বুঝতে, শিখতে। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ভ্রমণকারীরা শুধু মুখেই নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী অপরকে শোনাত না, লিখেও রাখতো খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ। সেই বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি কোন্ যুগে কোন্ রাজার আমলে কেমন ছিল আমাদের ঘর বাড়ি, খাওয়া দাওয়া, চলা হাঁটা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাষবাস, রাজ্য-শাসন, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ সব কিছু। সব সময়েই যে বিদেশী ভ্রমণকারীরা ঠিক কথা লিখে গেছে, এমন নয়। তবু ঠিকটুকুও বুঝে নিতে পারি অন্যের বিবরণ বা অন্যান্য উপাদানের সংগে মিলিয়ে বিচার করে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে যেসব ভ্রমণকারী এসেছে আমাদের দেশে, তাদের মধ্যে সকলের আগে মেগাস্থিনিসের নাম। ভারতবর্ষে তখন মৌর্য সাম্রাজ্য জমজমাট। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলেই দিগ্বিজয়ী গ্রীক যোদ্ধা আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারতবর্ষ জয় করতে। জয় করেও-ছিলেন অনেকখানি। এবং তা প্রায় বিনা বাধায়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার সংগে সংগে চন্দ্রগুপ্ত সে-সব রাজ্য গ্রীক সেনা-পতিদের দখল থেকে ছিনিয়ে নেন। তারপর আলেকজাণ্ডার মারা যাওয়ার ১৮ বছর পরে আলেকজাণ্ডারের সব-চেয়ে প্রিয় সেনাপতি সেলিউকস আবার ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়ালেন। মনের ইচ্ছা, প্রভুর মত তিনিও নিজের হাতে দখল করবেন ভারতবর্ষকে। কিন্তু ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্তের চেষ্টায় ভারতবর্ষ যে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সে খবর জানা ছিল না তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন, রাজায়-রাজায় ঝগড়া-বিবাদ চলেছে সেই আগের মতই। সেলিউকসের সব স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত গ্রীকদের অধিকার করা চারটে প্রদেশ উপহার দিয়ে তাঁকে সন্ধি করতে হল চন্দ্রগুপ্তের সংগে। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে খুব ভাব-ভালবাসা। দু দেশের মধ্যেও ভাই ভাই ভাব। এমন কি শুরু হয়ে গেল বিয়ে-শাদিও। শোনা যায়, চন্দ্রগুপ্ত নাকি বিয়ে করে-ছিলেন সেলিউকাসের এক মেয়েকে। সেলিউকাস স্বদেশে ফিরে গিয়ে কিছু-দিন পরেই এদেশে তাঁর দূত করে পাঠালেন মেগাস্থিনিসকে। তিনি এদেশে বহুদিন ছিলেন। কিন্তু ঠিক কত দিন তা জানার উপায় নেই। তাঁর কোন ছবি অর্থাৎ প্রতিকৃতিও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। দীর্ঘ-কাল এদেশকে দেখে শুনে তিনি যে ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন তার নাম

'ইণ্ডিকা'। সে বই এখন আর কোথাও নেই। এখন শুধু সমকালের অন্যান্য ইতিহাস রচয়িতাদের লেখার মধ্যেই উদ্ধৃতি হিসেবে টিকে আছে তাঁর রচনার অংশ বিশেষ। তবু সেইটুকু থেকেই আমরা যা জানতে পারি, সেটাও কম নয়। মেগাস্থিনিস বাস করতেন পাটলীপুত্রে। এখনকার পাটনা। তখন পাটলীপুত্র ছিল চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী। পাটলীপুত্রে থেকেই ভারতবর্ষের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি।

ভারতবর্ষের যে দুটো নদী তাঁর চোখে ঠেকেছে সবচেয়ে বড়, তাদের নাম সিন্ধু আর গঙ্গা। স্থল পথের চেয়ে নদী পথই লোকে ব্যবহার করতো বেশী। কেবল বর্ষাকাল ছাড়া। তখন বানের জলে নদী উপছে পড়তো মাঠ ঘাট ভাসিয়ে। বড় রাস্তাও ছিল একটা। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পাটলীপুত্র পর্যন্ত। রাস্তার দু পাশে গাছের ঘন ছায়া, পথ নির্দেশিকা, বিশ্রামাগার আর কুয়ো। গাছপালায় ছাওয়া এই দেশে তাঁর চোখে সবচেয়ে আশ্চর্যের ঠেকেছিল বটগাছ। পাঁচজন মানুষও দশখানা হাত জুড়ে বেড় দিতে পারবে না এমন গুঁড়ি এক একটা গাছের। এদের মধ্যে একটা বিশেষ বট গাছের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই একটা গাছের ছায়ায় খুব কম করে ৪০০ জন অশ্বারোহী দুপুর বেলায় খর রোদ থেকে অনায়াসে বাঁচাতে পারে নিজেদের মাথা।

মেগাস্থিনিসের মতে সেই সময়কার ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় নগর হল পাটলীপুত্র। তাঁদের ভাষায় 'পালিমবোথ্রা' নগরের চারদিকে পরিখা। পরিখার পর প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে ৬৪টা তোরণ আর ৫৭০টা গম্বুজ। মাঝখানে রাজপ্রাসাদ। কাঠের তৈরী। কিন্তু আগুন না-লাগার ব্যবস্থা করা। গোটা প্রাসাদে সোনারুপোর নক্সার কাজ। একবার তাকালে চোখ আর ফেরানো যায় না। মেগাস্থিনিসের মতে পারস্যের খানদানী সম্রাটদের রাজধানীর চেয়েও পাটলীপুত্র ছিল অনেক জাঁকজমকের। রাজপ্রাসাদের সামনে ফুলের বাগান। বাগানে ময়ূর। গাছে গাছে কত রকমের পাখি। উদ্যানের মাঝে মাঝে কৃত্রিম পুকুর। তাতে নানান রকমের মাছ। রাজার পোশাক ছিল সোনার জরিদার মসলিন। রাজসভায় যেতে আসতে সোনার পালকি। দেশের ধনী লোকেরা চাপতো হাতিতে। অথবা রথে। বাকীরা ঘোড়া আর উটে।

সাধারণভাবে ভারতবাসী, মেগাস্থিনিসের চোখে, লম্বা এবং রোগা। তাদের সাধারণ পোশাক হল সুতীর সাদা কাপড়। ধনীরা পরতো রঙীন ঝলমলে মখমলের পোশাক। কানে হাতির দাঁতের দুল। গায়ে সোনার গয়না। গয়নায় দামী দামী মণি মুক্তো। গলায় কখনো হার, কখনো ফুলের মালা। পায়ে পুরু গোড়ালী ওয়ালা চামড়ার জুতো। হাতে ছাতা। অনেকেই তাদের দাড়ি রঙ করতো নানা রঙে। সাদা, নীল, সবুজ, গোলাপী। ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে হতো খুব অল্প বয়সে। পুরুষদের থাকতো একাধিক স্ত্রী। তখনকার কালে পণ প্রথা ছিল না। গরীব লোকেরা মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারলে মেয়েকে বাজারে এনে বিক্রী করতো। বিয়ে হতো যার যার নিজের শ্রেণীর বা জাতির মধ্যে। মেগাস্থিনিসের মনে হয়েছিল ভারতীয়রা সাত জাতে ভাগ করা। যেমন দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পকার, বণিক, সৈনিক, পরিদর্শক, সভাসদ। দেশের বেশীর ভাগ লোকই ছিল চাষী। তারা বাস করতো গ্রামে। সকলেই প্রায় স্বাস্থ্যবান। ঘরে ঘরে অপর্যাপ্ত খাদ্য শস্য ফল মূল। মাঠে ফসল ফলতো বছরে দু'বার। মানুষের আচার ব্যবহার ছিল সহজ সরল। চুরি ডাকাতির ভয় নেই। ঘরের দরজা খুলে রেখেই লোকে নিশ্চিন্তমনে বেরিয়ে যেতো বাইরে। দেশে দুর্ভিক্ষ হোতো না, এবং দাসপ্রথা ছিল না। মেগাস্থিনিসের এই দুটো মন্তব্য একালের ঐতিহাসিকদের মতে ঠিক নয়। দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তবে ভয়ংকরভাবে নয়। এবং কচিৎ-কদাচিৎ। দাস প্রথাও ছিল। কিন্তু দাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ছিল না। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল মজবুত। সবাই আইন মেনে চলতো। অথচ কোথাও কোনো লিখিত আইন নেই।

ব্যবসা বাণিজ্য চলছে মুখের কথার উপর। সেই কারণেই মিথ্যাবাদীর শাস্তি ছিল কঠিন। অসুখে বিসুখে অথবা মনের সুখ হারালে লোকে ছুটে যেতো মুনি ঋষিদের কাছে। তাঁরা বাস করতেন বনে। পরণে গাছের ছাল। আহার বনের ফল। ওষুধপত্র ছিল গাছপালারই শিকড়-বাকড় ফলমূল।

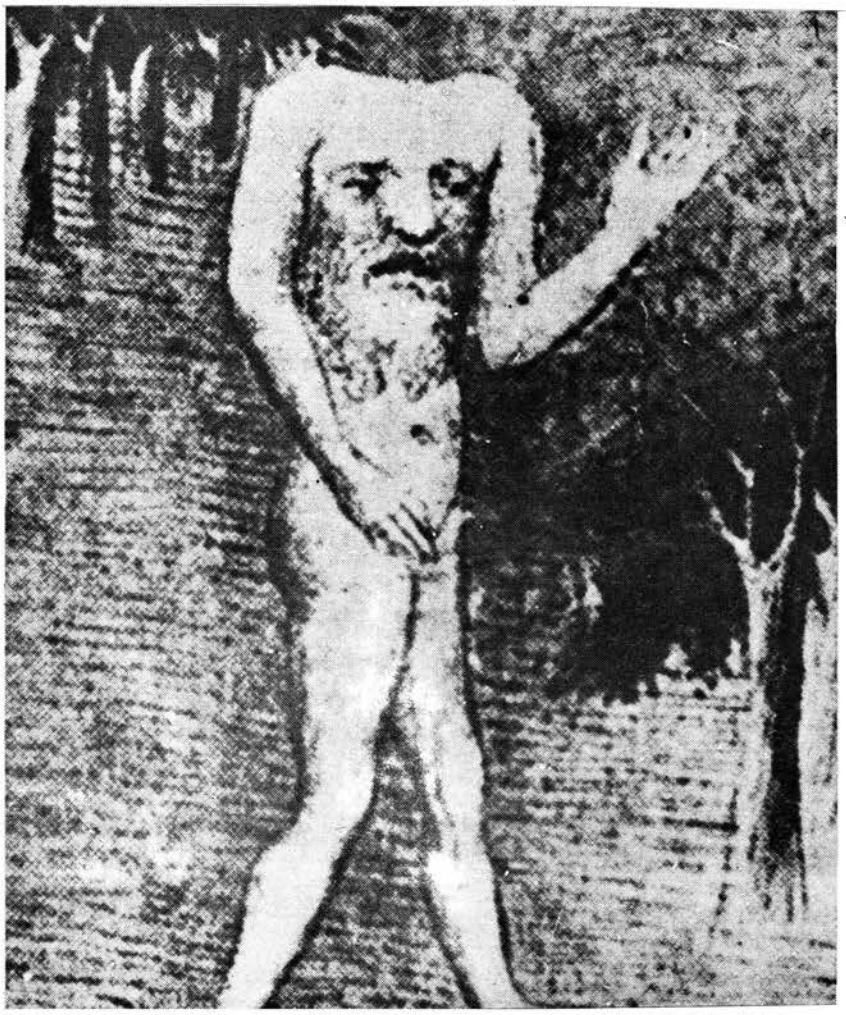

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যতই শক্তিশালী হোন না কেন, প্রতি মুহূর্তে তাঁর ছিল প্রাণনাশের ভয়। এই বুঝি কেউ এসে বুকে বসিয়ে দেবে তলোয়ার। খাবারে বুঝি মিশিয়ে দিল বিষ। খাবার মুখে দেবার আগে তাঁর সামনে পরীক্ষা করে দেখা হতো। এক ঘরে পর পর দুদিন তিনি শুতেন না। তাঁকে সব সময় ঘিরে থাকতো একদল সশস্ত্র মহিলা, দেহরক্ষীরূপে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকতো তাঁর গুপ্তচরের দল।

ভারতবর্ষ যে সোনার খনি, মণি-মুক্তোর দেশ এ তিনি আগেই জানতেন। ওগুলো বাদে তাঁকে অবাক করেছিল আরও দুটো জিনিষ। এক হল মধু। আসলে ওটা মধু নয়, গুড়। আর উল। ওটাও আসলে উল নয়, তুলো।

এসবের বাইরে আছে এমন কিছু অলৌকিক বর্ণন, যা শুনলে মনে হবে আজগুবি। এসবের সত্যি মিথ্যে যাচাই করার উপায় নেই। কেউ কেউ মনে করেন, এ-সব কথা তাঁর চোখে দেখা নয়। পরের মুখে শোনা। এই আজগুবিদের মধ্যে আছে পিঁপড়ে আর মানুষ। লম্বা চওড়ায় খ্যাঁক শিয়ালের মত আকৃতির এক ধরনের পিঁপড়ে নাকি তিনি দেখেছেন সিন্ধুর তীরে। তারা মাটির ভিতর গর্ত খুঁড়ে সোনার গুঁড়ো বা টুকরো বের করে আনতো। সাধারণ মানুষ সোনার লোভে ছুটে আসতো সেখানে। বুনো জন্তুজানোয়ারের মাংসে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যেতো তারা পিঁপড়েকে। তারপর নিজেরা কুড়িয়ে নিত সোনা।

মানুষের বিবরণ এর চেয়ে বিচিত্র এবং ভয়ংকর। তিনি দেখেছেন ৯ ফুট লম্বা মানুষ, যার নাক নেই। অন্য মানুষের এমন কান যে বিছানায় শুলে সেই কান এসে পায়ে ঠেকে। কোনো কোনো মানুষের পায়ের গোড়ালীটা সামনে দিয়ে, পিছনে আঙুল। এই শেষে নয়। এমন মানুষও তিনি দেখেছেন, যে একচোখা। কপালের মাঝখানে মাত্র একটাই চোখ। চোখ কপালে উঠে যাওয়ার মত বিবরণ। তাই না? তবে এইসব ইতিহাস পড়ার সময় তোমাদের দুটো চোখই যেন খোলা থাকে।

ম্যাজিকের মত পার্থসারথি চক্রবর্তী

চুম্বক লোহাকে টানে। তোমার দু'খণ্ড চুম্বক থাকলে, এক খণ্ডের উত্তর দিক অপর খণ্ডের দক্ষিণ দিক্‌কে আকর্ষণ করে ধরে রাখবে। তুমি একটা আস্ত চক্ অথবা পেন্সিলকে ভেঙে দু টুকরো করে আবার কি তাদের জোড়া লাগাতে পার? —না, পার না। কেননা পেন্সিল বা চকের ভেঙে যাওয়া টুকরো দুটো পরস্পরকে আকর্ষণ করে ধরে রাখতে পারে না।

কিন্তু যদি দুটো সীসার চোঙকে মুখোমুখি চেপে ধরা যায় তবে এক অবাক কাণ্ড হবে। চোঙ দুটো এত জোরে আটকে যাবে যে তাদের টেনে আলাদা করতে গেলে তোমাকে বেশ মেহনত করতে হবে। একটা লোহার ছুরি দিয়ে আটকে যাওয়া চোঙের মাঝখানে খুব জোরে চাপ দিলে তবেই তাদের আলাদা করা যাবে। ব্যাপারটা খুব মজার নয় কি?

সীসার চোঙের এই সুন্দর ভেল্‌কিবাজীটা দেখিয়ে সবাইকে তুমি একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। চোঙের মুখ দুটো বেশ ভালো করে কেটে চেঁছে মসৃণ করে নিয়ে তাদের মুখোমুখি চেপে ধর। ও দুটো আটকে গেলে তাদের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেইভাবে একটা লোহার স্ট্যান্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দাও। এইবার চোঙের তলার অ্যাংটায় একশো গ্রাম ওজন, তার নীচে একশো গ্রাম—এইভাবে ওজন ঝুলিয়ে দিলে দেখবে চোঙ দুটো প্রায় এক কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনকে ধরে রাখতে পারছে।

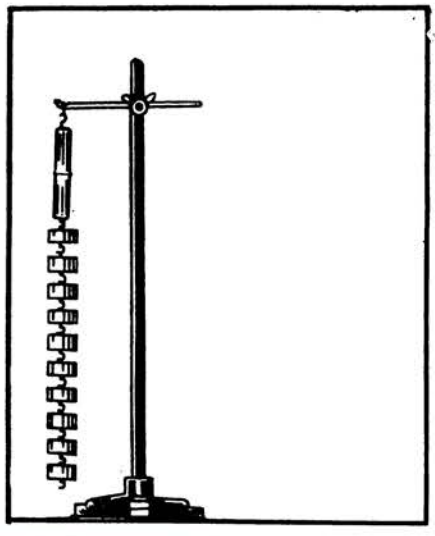

সীসা হচ্ছে খুব নরম ধাতু। সীসার চোঙ দুটির অণুদের মধ্যেকার আকর্ষণ বল এত বেশি যে, তাদের খুব কাছাকাছি আনতে পারলে এই বলের দরুন তারা আটকে যায়। লোহা, সোনা, অথবা তামার মত শক্ত ধাতুর বেলায় তাদের দু টুকরোর অণুরা এত কাছাকাছি আসতে পারে না। কাজেই দু'খণ্ড লোহা অথবা সোনাকে খুব কাছে এনে জোড়া যায় না।

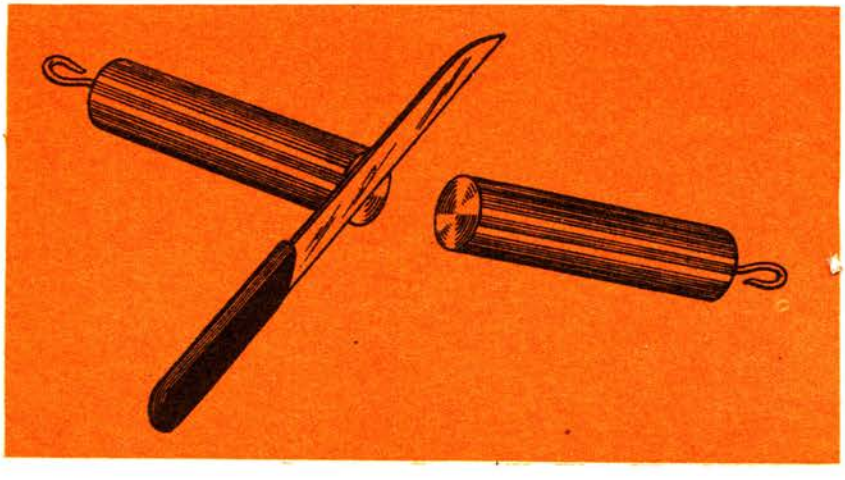

কি করে দাবা খেলতে হয়

এইতো বছর তিনেক আগে আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে কি লড়াইটাই না হয়ে গেল! চারিদিকে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। কলকাতাও অবশ্য তা থেকে বাদ পড়েনি। তোমরা হয়ত ভাবছ, সে কি ব্যাপার, আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে লড়াই হয়ে গেল? আসলে অবশ্য হয়েছিল দাবার লড়াই। যুদ্ধটা হয়েছিল আমেরিকার বব ফিশারের সঙ্গে রাশিয়ার বরিস স্পাসকির।

পিকু ঐ সময়েই তার বিল্টু মামার কাছ থেকে খেলাটা শিখে নিয়েছিল—কিন্তু আবু ঠিক করেছিল খেলাটা সে কিছুতেই শিখবেনা, কেননা ওর ধারণা ছিল খেলাটা ঠিক ছোটদের নয়। খেলাটা বুড়োদের জন্য, কারণ ওতে কোনরকম জোর খাটাতে হয় না। ওতে ফুটবল, ভলিবল বা সাঁতারের মত শরীরকে মজবুত করেনা! পিকু তাকে অবশ্য বুঝিয়েছিল যে এই খেলা দুর্বলদের জন্য মোটেই নয়। সত্যিকারের ভাল দাবা খেলোয়াড় হতে হলে শরীরটাকে আগে সুস্থ এবং সবল রাখা চাই।

গরমের ছুটিটা পড়ে যেতেই একদিন দুপুর বেলা আবুই পিকুর কাছে চলে গেল। গিয়ে বলল, দাবা খেলা শিখতে কি কি লাগেরে?

পিকু বলল, কি আবার লাগে। সামান্য কয়েক টাকার মধ্যে পাওয়া যায় একটা বোরড আর ৩২টা ঘুঁটি। ঘুঁটি অবশ্য নানা জিনিসের হয়। কাঠের ঘুঁটি খুব ভাল, তবে প্ল্যাসটিকের ঘুঁটিও খারাপ নয়, ছোট চুম্বক সেটও পাওয়া যায়। এগুলো নিয়ে বাসে বা ট্রামে খেলা চলে।

আবু বলল, এবার বল তো দেখি ঘুঁটি সাজাতে হয় কি ভাবে?

পিকু বলল, ঘুঁটি সাজানর আগে বোরডটিকে কি ভাবে বসাতে হয় সেটা জানা দরকার।

আবু বলল, সে কি? বোরডটা কি দশরকম ভাবে বসান যায় নাকি? ওটা তো টেবিলের উপর পেতে দিলেই হল।

পিকু বলল, তা হল—কিন্তু বোরডটাকে দেখ আগে। এতে প্রত্যেক সারিতে ৮টা করে ঘর রয়েছে, সব সমেত ঘর রয়েছে ৬৪টি। এইবার আমি বোরডটির এক ধারে বসলাম, তুমি বসলে উলটো দিকে। এবার আমার আর তোমার সবচেয়ে কাছেকার সারির দিকে তাকাও, কি দেখতে পাচ্ছ?

আবুর উত্তর দেওয়ার অপেক্ষা না করেই পিকু বলল, আমাদের প্রত্যেকের সবচেয়ে কাছে যে সারিটি রয়েছে তার সবচেয়ে ডানদিকের ঘরটা সাদা। এইটেই দাবার বোরড পাতার নিয়ম।

এবার বোরডটির ছবি দেখ, এটা ঠিক ভাবেই পাতা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে রয়েছে সাদার দলের রাজা এবং রানী এবং দুটো সাদা নৌকো। কালোরও তাই। লক্ষ্য করে দেখ সাদার দিকের প্রথম সারির ডানদিকের কোণে সাদা নৌকো বসেছে সাদা ঘরে, আর বাঁদিকের কোণে সাদা নৌকো বসেছে কালো ঘরে।

কালোর দিক

সাদার দিক

পিকু বলল, এবার বুঝতে পারলে কি ভাবে বোরড বসাতে হয়, আর সাদা এবং কালো রাজা রানী এবং নৌকো কোথায় বসে। পিকু অবশ্য বুঝিয়ে বলল এগুলি যেভাবে দেখান হয়েছে আসল ঘুঁটিগুলো সেরকম দেখায়না। আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে সাদা কুইন বসে সাদা ঘরে, আর কালো কুইন বসে কালো ঘরে।

এই ঘুঁটিগুলির সবচেয়ে বড় যেটি সেটা হল কিং। তার পরেরটা হল কুইন।

আবু বলল, কিং কুইন না বলে রাজা রানী বললেই তো হয়। পিকু বলল, এ খেলাটা তো আর বাংলা খেলা বা ইংরিজী খেলা নয় এটা এখন একটা আন্তর্জাতিক খেলা। আমাদের দেশে এই খেলার জন্ম হলেও এটা আমাদের কাছে আনন্দের বিষয় এটি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম মাথা খাটানর খেলা পৃথিবীতে আর নেই। এই খেলার আন্তর্জাতিক নিয়ম তৈরি হয়ে গেছে—এবং দাবা সম্পর্কে আমরা যেসব বই ভারতের বাইরে থেকে পাই তা ইংরিজী ভাষাতেই ছাপা হয়, তাই আমাদেরও ইংরিজী নামগুলো শিখে রাখলে ভাল হয়। দাবা খেলা নিউ-ইয়রকেই হোক বা লেনিনগ্রাডে হোক, লন্ডন বা কায়রোতে হোক, সর্বত্রই খেলার একটিই নিয়ম। প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক নিয়মটাই মেনে চলে। এমন কি আমেরিকান বা রাশিয়ানরা পর্যন্ত রাজাকে রাজাই বলে, ওদের দেশে রাজা নেই তা সত্ত্বেও!

পিকু বলতেই লাগল, তাহলে দাবায় ছক সাজাতে হয় জেনে নেবার আগে কোন ঘুঁটিকে কি বলে, এবং ইংরিজীতেই বা কি বলে জানা দরকার।

এর পর আগামী সংখ্যায়

হিমানীশ গোস্বামী

উপন্যাস

রাজা হওয়ার

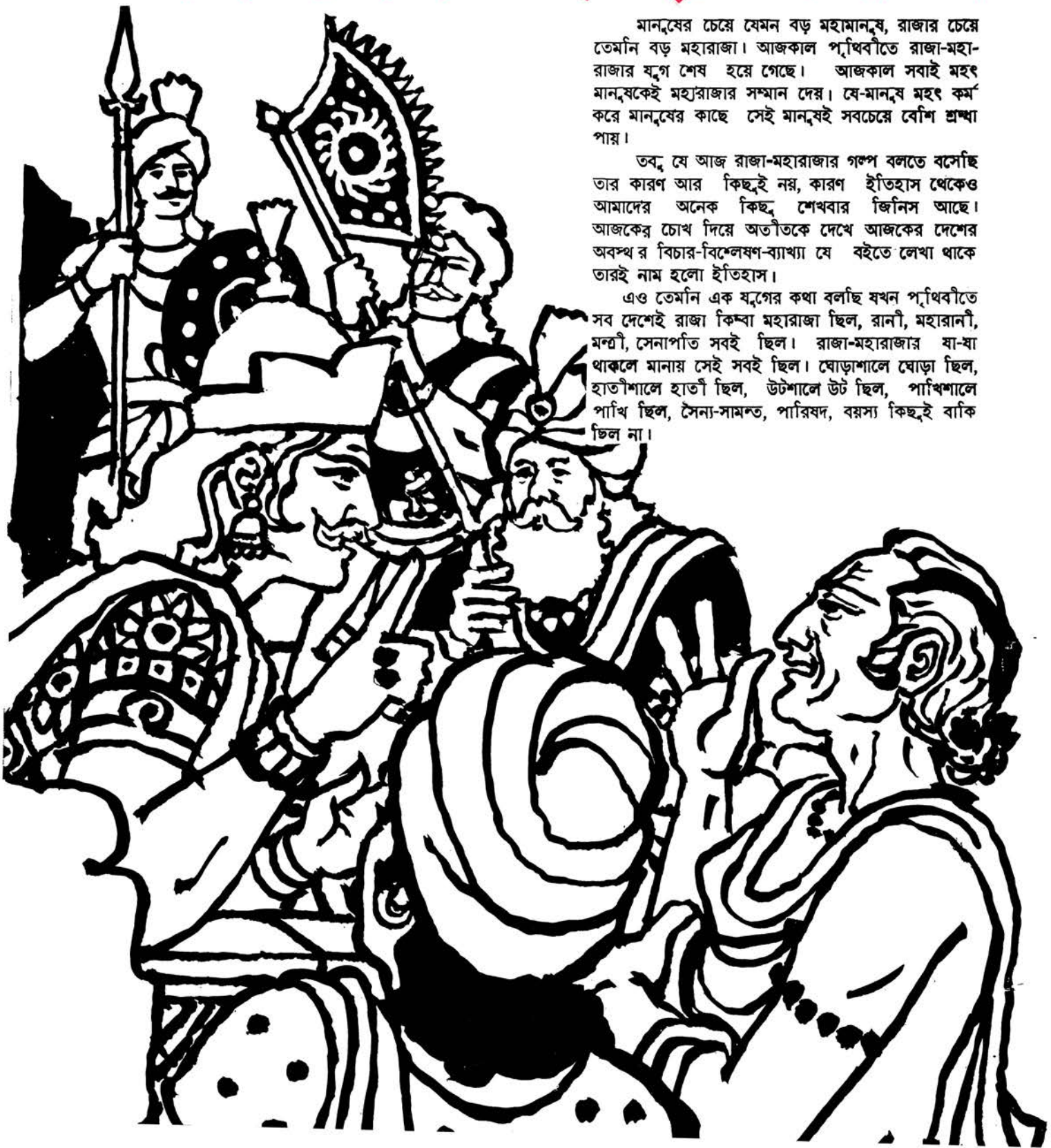

মানুষের চেয়ে যেমন বড় মহামানুষ, রাজার চেয়ে তেমনি বড় মহারাজা। আজকাল পৃথিবীতে রাজা-মহারাজার যুগ শেষ হয়ে গেছে। আজকাল সবাই মহৎ মানুষকেই মহারাজার সম্মান দেয়। যে-মানুষ মহৎ কর্ম করে মানুষের কাছে সেই মানুষই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা পায়।

তবু যে আজ রাজা-মহারাজার গল্প বলতে বসেছি তার কারণ আর কিছুই নয়, কারণ ইতিহাস থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখবার জিনিস আছে। আজকের চোখ দিয়ে অতীতকে দেখে আজকের দেশের অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা যে বইতে লেখা থাকে তারই নাম হলো ইতিহাস।

এও তেমনি এক যুগের কথা বলছি যখন পৃথিবীতে সব দেশেই রাজা কিম্বা মহারাজা ছিল, রানী, মহারানী, মন্ত্রী, সেনাপতি সবই ছিল। রাজা-মহারাজার যা-যা থাকলে মানায় সেই সবই ছিল। ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল, হাতীশালে হাতী ছিল, উটশালে উট ছিল, পাখিশালে পাখি ছিল, সৈন্য-সামন্ত, পারিষদ, বয়স্য কিছুই বাকি ছিল না।

ঝকমারি

বিমল মিত্র

দেশটার নাম বোম্বাগড়। বোম্বাগড় বেশ বড় রাজ্য। বোম্বাগড় রাজ্যের চারদিকে সমুদ্র। শত্রুদের আক্রমণের ভয় ছিল না। রাজ্যের প্রজারাও বড় সুখে শান্তিতে সংসার-ধর্ম পালন করতো। রাজা নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যে কোনও প্রজা অনাহারে মরতে পারবে না। কেউ আহার সামগ্রী না পেলে রাজার দরবারে এসে আর্জি পেশ করবে। যদি রাজা বোঝেন যে তার সাহায্য পাবার ন্যায্য কারণ আছে তবে রাজার ভাঁড়ার থেকে তাকে খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হবে।

আজকের দিনে এ-সব রূপকথার মত শোনাবে। কিন্তু ছিল। বোম্বাগড় রাজার এই রকম নিয়মই ছিল। বোম্বাগড় এই পৃথিবীতে ছিল যেন স্বর্গরাজ্য।

বোম্বাগড়ের রাজার নাম ছিল কন্দর্পনারায়ণ।

কন্দর্পনারায়ণ শুধু রাজাই ছিলেন না. দরিদ্র দুর্বল প্রজাদের বন্ধুও ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণের রাজকোষে যে কত মোহর, কত মণি, কত রত্ন, কত মাণিক্য, কত হীরে জহরত মুক্তো ছিল তার হিসেব তিনি নিজেও জানতেন না। রাজকোষের ভেতরে যেখানে ওই সব মণি-মুক্তা-জহরত-হীরে-সোনা-দানা থাকতো সেখানে যদি রাজা কখনও ঢুকতে চাইতেন তো তাঁকে চোখে দুপাট্টা কাপড় বেঁধে ঢুকতে হতো। তাঁর কত ধন-রত্ন আছে তা দেখবার অধিকারও তাঁর ছিল না। সেই রাজকোষের ইসপাতের দরজায় যারা পাহারা দিত তারা পুরুষানুক্রমে তা পাহারা দিয়ে আসতো। তারা ছিল বড় সৎ, বড় বিশ্বাসী। রাজা কন্দর্পনারায়ণ তাদের ওপরেই তাঁর রাজকোষের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। কোনও দিকে কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না তাঁর, রাজ্যের কোথাও কোনও অশান্তিও ছিল না।

কন্দর্পনারায়ণের দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম কীর্তি-নারায়ণ আর ছোট ছেলের নাম কান্তিনারায়ণ। দুই রাজপুত্রই রাজ-পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করে মানুষ হয়েছে। যেমন সুন্দর তাদের দুজনের চেহারা তেমনি সুশীল তাদের স্বভাব। তারা প্রজাদের সঙ্গে সৎভাবে মেলা-মেশা করে, তাদের সঙ্গে সৎ আচরণ করে। তাদের মধুর ব্যবহারে রাজ্যের পাত্র-মিত্র-অমাত্য-সেনাপতি-মন্ত্রী-কোটাল-রাজ-পুরোহিত সবাই খুশী। দুই ভাইয়ে খুব মিলও ছিল। তারা বিজয়ী, বিদ্বান, শ্রদ্ধাশীল, সংযত আর দেব-দ্বিজে ভক্তিমান।

সেই বোম্বাগড়ের রাজা কন্দর্পনারায়ণ একদিন মন্ত্রী-সেনাপতি-কোটাল-পাত্র-মিত্র-অমাত্য-রাজ-পুরোহিত-বয়স্য সকলকে ডাকলেন। সবাই বোম্বাগড়ের রাজ-দরবারে এসে জুটলো। রাজার দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তি-নারায়ণও বসলো কন্দর্পনারায়ণের দুই পাশে।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—দেখুন, আজকে একটা শুভ সংবাদ ঘোষণা করবো বলেই এখানে আপনাদের সকলকে ডেকেছি। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আমার অবসর গ্রহণ করবার সময় হয়েছে।

সংবাদটা উপস্থিত শ্রোতাদের কারো কাছেই শুভ মনে হলো না।

রাজ-পুরোহিত দারুকেশ্বর পণ্ডিত মাঝখানে বললেন—না মহারাজ, আপনি শতায়ু হয়ে রাজত্ব করুন এই ই আমরা চাই। আপনি এত শীঘ্র কেন অবসর গ্রহণ করার কথা ভাবছেন? আমি আপনার জন্ম পত্রিকা গণনা করে দেখেছি আগামী বিংশতি-বর্ষ পর্যন্ত আপনার জীবনের কোনও বিপদাশঙ্কা নেই—। তা ছাড়া বোম্বাগড় সম্পদশালী রাজ্য,, এ-রাজ্যের প্রজারা আপনার অত্যন্ত অনুগত। বোম্বাগড় চারদিক থেকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, কোনও বহিঃশত্রুর দ্বারা এ-রাজ্য আক্রমণেরও আশঙ্কা নেই। আর সব চেয়ে বড় কথা আমাদের নিকটস্থ দেশ জম্মুদ্বীপ। সেই জম্মুদ্বীপের মহারাজা দশবাহুধারী আমাদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন। আপনার এখন অবসর গ্রহণের কথা ওঠে না—।

দরবারে উপস্থিত অন্যান্যরাও রাজ-পুরোহিত দারুকেশ্বর পণ্ডিতের কথাতে সায় দিলেন।

তাঁরাও বললেন—হ্যাঁ মহারাজ, রাজ-পুরোহিত যা বলেছেন তার সঙ্গে আমরাও একমত।

মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ সকলের মতই শুনলেন। কিন্তু তবু তিনি তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটুট রইলেন। বললেন—না, আপনাদের সকলের শুভ-ইচ্ছার জন্যে আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, তবু বলবো আমি অনেক চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোঁছি। আমার এ-সিদ্ধান্ত আর নড়-চড় হবার নয়। আমি বিশ্বাস করি শারীরিক আর মানসিক শক্তি বজায় থাকতে থাকতেই সকলের অবসর গ্রহণ করে ভগবৎ-চিন্তায় অন্তিমকালের জন্যে নতজানু হয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত। তাতেই মানুষের মঙ্গল। আমি স্থির করেছি, আমি সিংহাসন ত্যাগ করে আমাদের রাজ-বংশের প্রথা অনুযায়ী বানপ্রস্থ গ্রহণ করবো। অর্থাৎ আমি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে অরণ্যে চলে গিয়ে নিরাসক্ত হয়ে শেষ জীবনটা কাটাবো।

তারপর একটু থেমে বললেন—আর আমি স্থির করেছি আমার সিংহাসনে বসবে আমার এই দুই পুত্র, কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণ—এরা যথার্থ শিক্ষা লাভ করেছে, এদের আমি নানাভাবে পরীক্ষা করেছি। এরা বিদ্যায়, বিনয়ে, ন্যায়-বিচারে, ব্যক্তিত্বে সর্ব বিষয়েই আমার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হবে বলে আমি মনে করি। আপনারা কি বলেন?

রাজ-পুরোহিত, মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র-অমাত্য-বয়স্য সবাই হতবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরলো না। এক সিংহাসনের দুই উত্তরাধিকারী কি করে হয়! বোম্বাগড়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম পুত্রই রাজ-সিংহাসনে বসবার অধিকারী। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্র থাকলে রাজ-সিংহাসনের ওপর তাদের কোনই অধিকার জন্মায় না। আর শুধু বোম্বাগড় কেন ভূ-ভারতে সর্বত্রই এই নিয়ম। একটি মাত্র সিংহাসনে দুজন রাজা বসবে কি করে? রাজ-পুরোহিত, মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র তারা সবাই কার আদেশ পালন করবে? কাকে তারা 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করবে? তা

যদি হয় তাহলে দুই রাজাতে যে রেষারেষি বাধবে, দুজনে যে সর্ব-বিষয়ে ঝগড়া বাধাবে! বোম্বাগড় রাজ্য তাহলে যে রসাতলে যাবে! তারা সবাই থাকতে এমন অন্যায় ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের ইচ্ছে জন্মসূত্রে প্রথম রাজপুত্র কীর্তিনারায়ণই রাজার সিংহাসনে বসুক আর দ্বিতীয় রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ দেশের নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ ভাতা, রাজকোষের একাংশ এবং বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক।

সবাই একবাক্যে সেই মতই প্রকাশ করলে। রাজ-পুরোহিত দারুকেশ্বর পণ্ডিতও শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করে সেই যুক্তিই মহারাজার সামনে রাখলেন।

মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ কারোর যুক্তিই শুনলেন না। বললেন—আপনাদের যুক্তি আমি শুনলাম। আপনারা যা বলেছেন তাই-ই বরাবরের নিয়ম। এই নিয়মই এতদিন আমার রাজ্যে চলে আসছিল। কিন্তু আজ থেকে আমি এ নিয়ম বদলাবো। আমি এ-রাজ্যে নতুন আইন সৃষ্টি করবো। আমি ছিলাম আমার পিতার একমাত্র পুত্র, তাই আমার সিংহাসন অধিকারের সময় এ-সমস্যার উদয় হয়নি। এই রাজ-বংশের পূর্বপুরুষদেরও সকলেরই একটি করে পুত্র সন্তান হয়েছিল। তাই তাঁদের বেলাতেও কখনও এই প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক্ আমার দুই পুত্র-সন্তান। আমার কীর্তিনারায়ণ এবং কান্তিনারায়ণ দুজনেই আমার কাছে সমান প্রিয়। দুজনেই সমান বিদ্বান, সমান বিনয়ী, সমান পারদর্শী। কেবলমাত্র তফাৎ এই যে কীর্তিনারায়ণ কান্তিনারায়ণের চেয়ে বয়েসে এক বছরের বড়। শুধু কি বয়েসে বড় হবার অধিকারেই কীর্তিনারায়ণ রাজা হবার অধিকারী হবে, আর কান্তিনারায়ণ বয়েসে এক বছরের ছোট হবার অপরাধে রাজা হবার অধিকার হারাবে? যে দৈবের ওপর তাদের দুজনেরই হাত ছিল না সেই দৈবের কারণে একজন সম্মানিত হবে আর একজন সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে এই-ই কি সুবিচার? একেই কি আপনারা সুবিচার বলবেন? শাস্ত্রে যা-ই লেখা থাক, শাস্ত্র যে-যুগে লেখা হয়েছিল সেই যুগ বদলে গেছে, সুতরাং নতুন করে আবার যুগোপযোগী শাস্ত্র লেখা উচিত।

রাজ-পুরোহিত দারুকেশ্বর শাস্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন —তাহলে কি দুই রাজকুমারই রাজ-সিংহাসনে বসবেন, এই-ই কি আপনার নির্দেশ? এই-ই কি আপনার বিধান? তাহলে কি একই সঙ্গে দুইজনেরই রাজ্যাভিষেক হবে?

মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বললেন—হ্যাঁ, তাই-ই আমার নির্দেশ, তাই-ই আমার বিধান।

মহারাজার এ-কথার উত্তরে উপস্থিত কারো কিছু কথা বলবার সাহস হলো না।

শুধু মন্ত্রী ভূপপ্রতাপ সিং সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন—একটা সিংহাসনে তো দুজন রাজা বসতে পারবেন না মহারাজ, তাহলে কি আর একটা সিংহাসন তৈরি করবার হুকুম দেব?

মহারাজা বললেন—না।

ভূপপ্রতাপ সিং বললেন—মহারাজার সিংহাসনটা তো একজন বসবার জন্যেই তৈরি হয়েছিল। দুজন বসবার মত তো জায়গা নেই ওতে। ওটাতে দুজনের বসতে তো কষ্ট হবে মহারাজা—

মহারাজা বললেন—আমি তার ব্যবস্থাও করেছি। ব্যবস্থাটা আপনাদের পরিষ্কার করে বলি। আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস পূর্ণ হয়েছে। বলতে গেলে এই বয়েসেই আমার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ-বৃদ্ধ প্রপিতামহ সবাই বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছিলেন। আমি বানপ্রস্থে যাবার পর রাজ-সিংহাসন তো শূন্য রাখা যায় না। তাই আমি ঠিক করেছি তখন আমার সিংহাসনে বসবে আমার মাথার এই মণি-রত্ন-খচিত মুকুট—

ভূপপ্রতাপ সিং অবাক হ'য়ে গেলেন। বললেন—সে কি মহারাজ?

মহারাজ বললেন—হ্যাঁ, আমার দুই রাজকুমারদের বদলে আমার এই মণি-রত্ন-খচিত মুকুটেরই রাজ্যাভিষেক হবে—আর আপনি আমার রাজ্যের বিচক্ষণ এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রী, আপনিই আমার এই মুকুটের বকলমায় রাজ্য শাসন প্রজাপালন করবেন। আমার অনুপস্থিতিতে আমার এই মুকুটের বেনামদার হবেন আপনি। আপনার ওপর রাজ্য-শাসন আর প্রজা-পালনের দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে বানপ্রস্থে যেতে পারবো—

দরবারের সমস্ত লোক মহারাজা কন্দর্পনারায়ণের এই অভিনব সিদ্ধান্তের ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভূপপ্রতাপ সিং জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে রাজকুমারদের কী হবে?

মহারাজা বললেন—ওদের কথা বলবার জন্যেই তো আমি আপনাদের সকলকে ডেকেছি। যতদিন ওরা আমার একটা শর্ত পালন না করতে পারবে ততদিন আপনিই আমার হয়ে রাজ-কার্য চালিয়ে যাবেন—

কী শর্ত?

মহারাজা বললেন—শর্তটাও পরিষ্কার করে বলি। আপনারা জানেন আমার রাজকোষে প্রভূত ঐশ্বর্য জমা রয়েছে। আসলে কত হীরে, কত সোনা, কত মোহর, কত রুপো, কত মুক্তো, কত বৈদূর্যমণি, কত কৌস্তুভমণি, কত মরকতমণি আছে তা আমারও জানা ছিল না। রাজ-কোষের ভেতরে আমি অনেকবার প্রবেশ করেছি, কিন্তু সেখানে যাবার আগে চোখের ওপর দুপাট্টা কাপড় ঢাকা দিয়ে তবে সেখানে আমাকে যেতে হয়েছে। একমাত্র বানপ্রস্থে যাবার আগেই তা মহারাজাদের দেখবার অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। তাই আমি কাল রাত্রে প্রহরী-সর্দারের অনুমতি নিয়ে তা দেখেছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—সেখানে কী দেখেছি তা আপনাদের বলবার অধিকার আমার নেই। বাইরের জগতের কাউকেই তা বলা নিষেধ। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে আমি বানপ্রস্থে যাবার আগে দুই রাজকুমারকে আমাদের রাজকোষের সমস্ত ঐশ্বর্য দুই ভাগে ভাগ করে দিতে চাই। তার জন্যে আগে থেকেই আমি আপনাদের সম্মতি নিয়ে রাখছি—

মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজ-পুরোহিত, পাত্র-মিত্র-অমাত্য-পারিষদবর্গ নত মস্তকে মহারাজার কথায় সম্মতি দিলেন। সবাই বললেন—সাধু—সাধু—এতে আমাদের পূর্ণ সম্মতি আছে—

মহারাজা বললেন—কিন্তু তা তো হলো, একটা জিনিস নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছি—

—সে কী জিনিস মহারাজ?

মহারাজা বললেন—একটা মরকতমণি। একটা মরকতমণিকে কি করে দু ভাগে ভা করবো তাই বুঝতে পারছি না। মতকতমণিটার দাম এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা। মরকতমণিটাকে যদি কাটা যায় তাহলে ওটা খারাপ হয়ে যাবে। এখন আপনারা প্রস্তাব করুন ওটা কাকে দেব? বড়রাজকুমারকে না ছোটরাজকুমারকে?

উপস্থিত সবাই বড় চিন্তায় পড়লো। কেউ ঠিক করতে পারলে না কাকে মরকতমণিটা দেওয়ার প্রস্তাব তারা করবে। এমন একটা প্রস্তাব করতে হবে যাতে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ না পায়। সকলেই দুর্ভাবনায় মাথা চুলকোতে লাগলেন।

মহারাজা বললেন—আপনারা তো কেউই প্রস্তাব দিতে পারলেন না। এবার আমি যা ঠিক করেছি তা আপনাদের জানাচ্ছি। আমি চাই এই এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা-মূল্যের মরকতমণিটি দান করে দেব।

—এত দামী মণি দান করে দেবেন? কাকে?

মহারাজ বললেন—পৃথিবীর মধ্যে যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ, তাকে।

—সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ? সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধকেই এই অমূল্য মণিটি দান করবেন?

—হ্যাঁ।

—কী করে বুঝবেন যে কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ?

মহারাজা বললেন—তাও আমি স্থির করে রেখেছি। তাহলে আপনারা মন দিয়ে শুনুন কী করে বুঝবো কে এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ—শুনুন তাহলে—

(ক্রমশঃ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

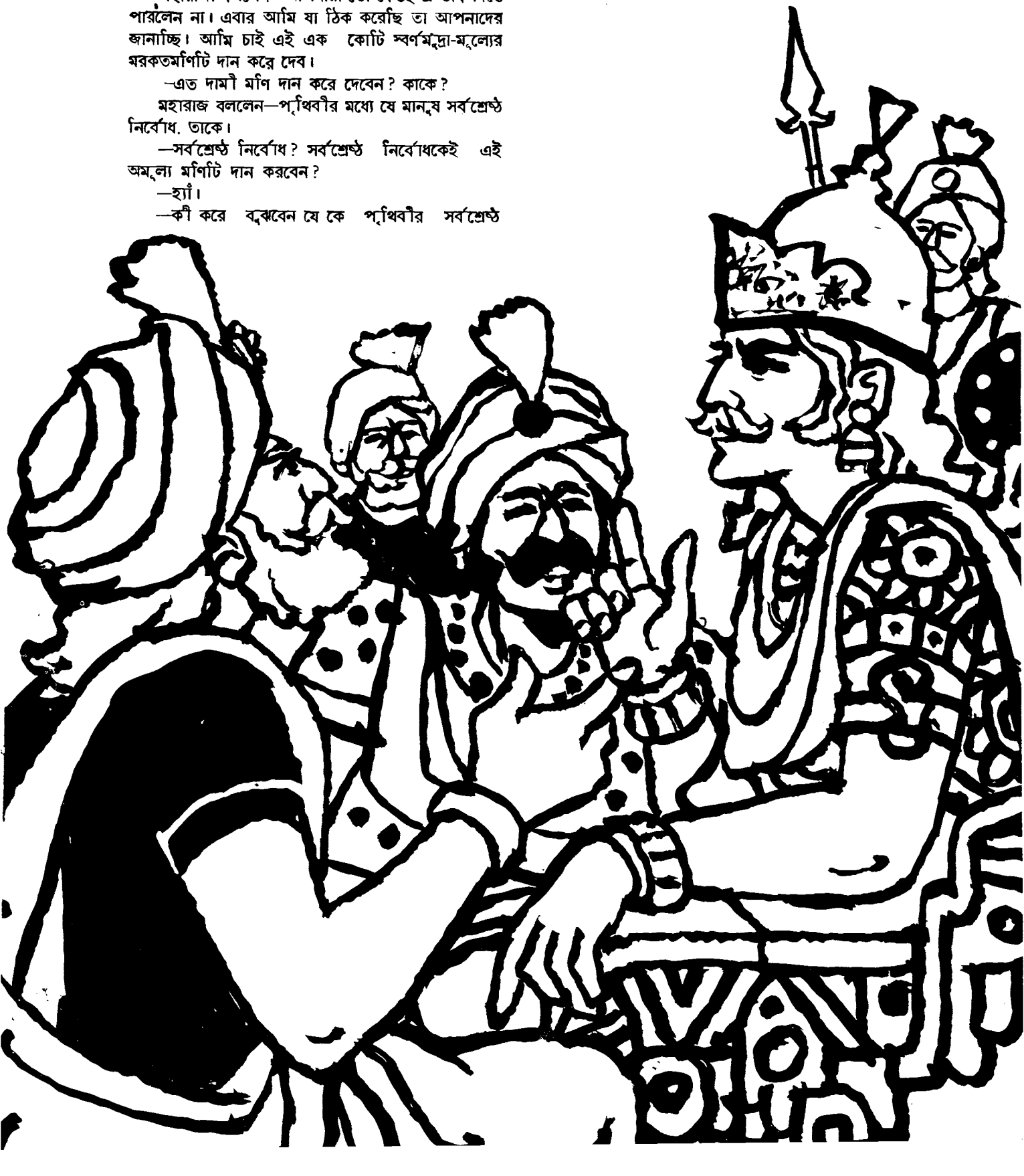

জোন অব আর্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটা মেয়ে যদি ছেলেদের মতন প্যান্ট-সার্ট পরে, তা হলে সেটা কি খুব দোষের? আজকাল তো অনেকেই পরে। যার যে-রকম শখ সে সে রকম জামা কাপড় পড়বে। কিন্তু এক সময়ে একটি মেয়েকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, সে পুরুষের মতন পোশাক পরতো বলে।

মেয়েটি জন্মেছিল একটি গ্রামে। অনেকদিন আগের কথা তো, তখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখার তেমন সুযোগই ছিল না। সে শিখেছিল সুতো কাটতে আর শেলাই করতে। কিন্তু সাধারণ গ্রামের মেয়ের মতন সে জীবন কাটায়নি। মাত্র উনিশ বছর বয়েসেই সে একটা অসাধারণ কান্ড করে ফেলেছিল। সে পুরুষের পোশাক পরে একা একা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে শহরে এলো। সোজা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে রাজার সামনে এসে দুম করে বললো, আমি যুদ্ধ করবো। আপনারা তো কেউ পারছেন না, খালি হেরে যাচ্ছেন, এবার আমাকে সেনাপতি করে দিন, আমি ঠিক জিতিয়ে দেবো!

রাজসভায় সকলেই তো দারুন অবাক! এ মেয়েটা বলে কি? বাঘা বাঘা সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসছে—আর এই অদ্ভুত জামা-প্যান্ট পরা একটা মেয়ে যুদ্ধ করবে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে যুদ্ধ করবে? তুমি কি যুদ্ধ করতে জানো? মেয়েরা কি যুদ্ধ করতে পারে?

মেয়েটি খুব জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ আমি পারবো। ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন। আমিই আমার দেশকে স্বাধীন করবো।

মেয়েটির নাম জান্। জাতে ফরাসী। তখনকার দিনে নামের সঙ্গে পদবী থাকতো না, গ্রাম বা মহকুমার নামটা জুড়ে দেওয়া হতো। ওদের মহকুমার নাম ছিল আর্ক। তাই ফরাসীতে ওর পুরো নাম জান্ দা'র্ক। ইংরেজিতে বলে জোন্ অব আর্ক। যে গ্রামে সে জন্মেছিল, সেটার নাম ডমরেমি। তাই জোন্ অব ডমরেমি নামেও অনেক সময় মেয়েটির পরিচয় দেওয়া হয়। পৃথিবীতে যে-সব মেয়েদের চিরকাল মনে রাখবে সবাই, এই মেয়েটি তাদের একজন। সত্যি সে অদ্ভুত রকমের ভালো মেয়ে ছিল।

তার যখন মাত্র তের বছর বয়েস, তখন থেকেই সে তার আশে পাশে ফিসফাস কথা শুনতে পেত। যেন অদৃশ্য থেকে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। প্রথমে দু'একবার সে ভয় পেয়েছিল বটে, তারপর কান পেতে শুনে বুঝতে পারলো, দেব-দূতরা তাকে যেন কি বলতে চাইছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ জ্বলে উঠতো তীব্র আলো। দেবদূতরা তাকে বলতো, জান্, ওঠো, জাগো, তোমাকে যে অনেক কাজ করতে হবে! তোমার দেশের এখন খুব দুর্দিন। তোমাকে দুঃখ ঘোচাবার ভার নিতে হবে!

এত লোকজনের মধ্যে ঐ মেয়েটিকেই কেন বেছে নিয়েছিলেন দেবদূতেরা? তার কারণ, সে ছিল খুবই সরল আর পবিত্র। তার মনে কোনো পাপ ছিল না। যাদের মনে কোনো পাপ থাকে না, তারাই সবচেয়ে বেশী সাহসী হয়।

তখন ফরাসী দেশের সত্যিই খুব দুর্দিন। দেশটা প্রায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ইংরেজরা অনেক জায়গা জয় করে নিয়েছে। অনেক ফরাসী জমিদার রাজাকে ছেড়ে ইংরেজদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন পলাশী যুদ্ধের সময় আমাদের বাংলাদেশের অনেক ছোটখাটো রাজা এবং জমিদার বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের দলে যোগ দিয়েছিল। ফরাসী দেশে অবশ্য এই ব্যাপারটা ঘটেছিল সাড়ে পাঁচশো বছর আগে। রাজা ষষ্ঠ চার্লসের ছেলে ডফিন তখন যুবরাজ, সে নিজেও অপদার্থ, অনবরত যুদ্ধে হারছে।

উনিশ বছরের মেয়েটির কথা শুনে যুবরাজ ভাবলেন, দেখাই যাক না, এ কি করতে পারে!

আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই উনিশ বছরের মেয়েটিকে সেনাপতি হিসেবে মেনে নিতে সৈন্যরা আপত্তি করলো না! সে এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে পতাকা নিয়ে যেই দাঁড়ালো আর অমনি সৈন্যদের মধ্যে দারুন উৎসাহ দেখা দিল, তারা চিৎকার করে বললো, দেশকে স্বাধীন করতেই হবে!

জানের সৈন্যবাহিনী একটার পর একটা শহর দখল করতে লাগলো। খুব পুরোনো শহর রেইম—সেটা জয় করে সেখানে সে যুবরাজ ডফিনকে সিংহাসনে বসালো। ইংরেজ সৈন্যরা ভয়ে ছত্রখান হয়ে পালালো। জানের চোখের রং গাঢ় নীল, মাথা ভর্তি সোনালি চুল, মুখখানা ফুলের মত সুন্দর, কিন্তু বুক ভর্তি সাহস। পৃথিবীতে এত কম বয়েসী কোনো মেয়ের অধীনে আর কোনো সৈন্য-বাহিনী কখনো যুদ্ধ করেনি।

শেষ পর্যন্ত ফরাসী দেশের এক জমিদারই ষড়যন্ত্র করে ধরিয়ে দিল তাকে। বার্গান্ডির ডিউক তাকে বিক্রি করে দিল ইংরেজদের কাছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে। ইংরেজ সৈন্যরা আবার জয় করে নিতে লাগলো আগের জায়গাগুলো।

ইংরেজরা বিচার করলো মেয়েটির। ঠিক নিজেরা বিচারকের আসনে বসেনি, যে-সব ফরাসী বিশ্বাসঘাতক তাদের দলে যোগ দিয়েছিল, তাদের দিয়েই এ কাজ করলো। এদের পান্ডা বোভ্ নামে একটা মঠের বিশপ। এই বিশপ তো ইংরেজদের খুশী করার জন্য আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, জান্‌কে কি শাস্তি দেবে।

জানের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল দুটি। সে কেন মেয়ে হয়েও ছেলেদের মতন পোশাক পরেছে। সে কেন দেবদূতদের নামে মিথ্যে কথা বলেছে? ভগবান কি কখনো ফরাসীদের বলতে পারেন ইংরজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে! আসলে সে যে ইংরেজদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল এই কথা স্বীকার করতেই যে ইংরেজদের লজ্জা! তাই কতকগুলো মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য।

বিচার সভায় জান্ সরল সাহসের সঙ্গে বললো, আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি না। ভগবানের নির্দেশেই আমি যুদ্ধ করেছি। দেশকে স্বাধীন করা পাপ নয়। যুদ্ধের সময় পুরুষের পোশাক পরা পাপ নয়। ভগবানের দয়া না থাকলে আমি যুদ্ধ করলাম কি করে! ভগবানের দূত আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

বিচারকরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি ভগবানের দূতদের নিজের চোখে দেখেছো?

জান্ বললো, হ্যাঁ দেখেছি, আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাঁদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের দয়া চেয়েছি।

বিচারকরা বললেন, এ মেয়েটা নিশ্চয়ই ডাইনি। ও ভগবানের দূতদের দেখেনি, দেখেছে শয়তানের দূতদের। নইলে, মেয়ে হয়েও কেউ যুদ্ধ করে?

শাস্তি দেওয়া হলো, ওকে পুড়িয়ে মারা হবে। কি নিষ্ঠুর ঐ লোকগুলো, ধর্মের নামে অমন সুন্দর একটি মেয়েকে পুড়িয়ে মারতে ওদের লজ্জা হয় না। ওদের বিচার কত মিথ্যে। ওদের বিবেক বলে কিছু ছিল না! একটা উঁচু মঞ্চ তৈরি করে, সেখানে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো ঐ মেয়েটিকে, তারপর মশালের আগুন এনে...

মশালের আগুনটা গায়ের কাছে আসতেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জান্। মরতে কি কারুর ইচ্ছে করে। সে চিৎকার করে বললো, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমি তোমাদের সব কথা শুনবো, আমাকে মেরো না!

তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে তাকে নামিয়ে আনা হলো। রাখা হলো একটা জেলখানায়। একটা মেয়েদের পোশাক দিয়ে বলা হলো, এইটা পরো!

পোষাক বদলে নিল মেয়েটি। জামা আর প্যান্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল এক কোণে। তখনও তার শরীর কাঁপছে। আর একটু হলেই তার সারা গায়ে আগুন ধরে যেত।

তিন দিন জেলখানায় বন্দিনী হয়ে রইলো সে। তারপর তার মনের জোর এবং সাহস ফিরে এলো আবার। সে মরতে ভয় পাবে কেন? সে তো কোনো অন্যায় করেনি, সে যা কিছু করেছে সবই তো ভগবানের নির্দেশে। পুরুষের পোষাকটা আবার কুড়িয়ে এনে পরে ফেললো সে। বিচারকদের ডেকে বললো, আমি তোমাদের বিচার মানি না। আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমরা ভগবানের কথা অস্বীকার করাতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি আগে যা বলেছি, ঠিকই বলেছি।

জানকে আবার ডাইনি বলে ঘোষণা করা হলো। আবার তার হাত পা বেঁধে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আগুন। এবার সে একটুও ভয় পেল না, তার ঠোঁটে লেগে রইলো হাসি, হাত দুটো জোড় করা রইলো আকাশের উদ্দেশে। ১৪৩১ সালের ৩০ মে সেই উনিশ বছরের মেয়েটির শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তারপর অনেক দিন বাদে ফরাসী দেশ আবার স্বাধীন হয়েছে। তারা তখন সম্মান জানিয়েছে মেয়েটিকে। বড় বড় সব সন্ত ও অবতারদের ছবির পাশে টানানো হয়েছে তার ছবি। কত বই, কত নাটক লেখা হয় তাকে নিয়ে। ডমরেমি গ্রামের সেই মেয়েটির স্থান আজ সমস্ত স্বাধীনতা-প্রেমিকদের হৃদয়ে। আর যে বিশপটি তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছিল, তার দেহ কবরখানা থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে নর্দমায়।

পিঁপড়ের আতিথেয়তা

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে, পিঁপড়ের আবার অতিথি সেবা! পরের সেবা করবে কি, ওরা তো নিজের সেবার জন্যেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের জ্বালায় খাবারপত্র রাখার জো আছে? কোথায় সন্দেশ লুকিয়ে রেখেছি, অথবা এক টুকরো কেক। কিছুক্ষণ পর এসে দেখি, ঠিক মশায়রা হাজির হয়েছেন। তা আসবি তো একক জন আয়। কিন্তু তা আসবে কেন? একেবারে দল ধরে আসা। আর এসেই সাবাড় করতে শুরু করা। তাড়িয়ে যে দেব, তারও উপায় নেই। কোন রকমে একটি যদি গায়ে এসে পড়ে, অমনি কুটুস কামড়। আর কি তার জ্বালা! পাঁউরুটির ওপরকার সেই খুদে পিঁপড়েই হোক, কিংবা আম গাছের সেই লালচে রঙের হাড়গিলে পিঁপড়ে, সুযোগ পেলেই সবাই কুটুস করে। ওরা আবার পরকে খাওয়াবে কি?

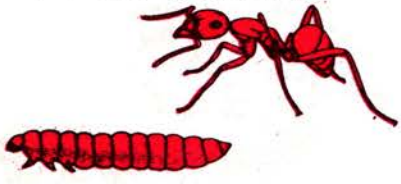

কথাটা অবশ্য ঠিক। সুযোগ পেলে পিঁপড়ে কখনও হুল না ফুটিয়ে ছাড়ে না। তবে এমনও দেখা যায়, অনেক সময় তারা পরের সেবার জন্যেও পিছু পা হয় না। আমার কথায় অনেকেই হয়ত তোমরা অবাক হচ্ছ। কিন্তু যা বলছি, সত্যি। বেশ কয়েক রকমের পোকামাকড় এবং পিঁপড়ের মত সন্ধিপদ প্রাণী সত্যিই পিঁপড়ের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করে। বলছি না, পিঁপড়েরা

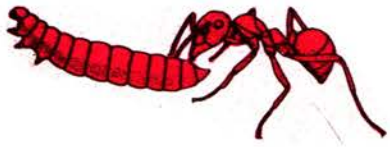

তাদের আদর করে ডেকে আনে। নিজেদের স্বার্থে তারাই পিঁপড়েদের বাড়ি বয়ে আসে। এসে কখনও বা তাদের নতুন বাচ্চাদের খেয়েও ফেলে। আশ্চর্যের ব্যাপার, পিঁপড়েরা তাদের কোন ক্ষতি করে না। বরং কোন রকম বাধা না দিয়ে নিজেদের বাড়িতে তাদের আসতে দেয়। দরকার হলে তাদের খাওয়ায়, আদর যত্ন করে, কখনও বা তাদের বাচ্চাদের দেখা শোনাও করে। আর এসব পাওয়ার জন্যে কত রকমের চালাকিই না করতে হয় সেই সব অতিথিদের।

এক ধরনের কাঁচ পোকার কথাই

ধর। এদের নাম আতেমেলস পুবিকলিস। বুঝতেই পারছ, নামটা বিদেশী। এদের পাওয়া যায় ইউরোপে। শুককীট অবস্থায় ওদের মায়েরা ওদের ছেড়ে দিয়ে আসে এক জাতের পিঁপড়ের বাসার কাছে। এই পিঁপড়েদের নাম ফরমাইকা পলিকটেনা।

শুক কীটরা কি করে জানো? ওদের গা থেকে এক ধরনের রস বের করতে থাকে। ওই রসের গন্ধে পিঁপড়েরা এগিয়ে আসে। শুক-

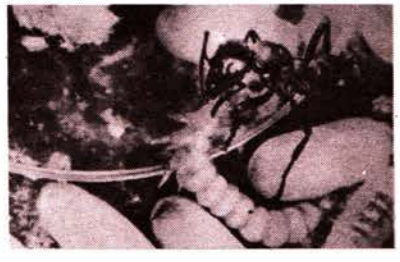

কীটদের টেনে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাদের লালন পালন করতে থাকে।

না, অতিথিরা কিন্তু চালাকীতেও কম যায় না। কত্তার কি করে নজরে পড়তে হয় সেটা তারা ভালভাবেই জানে। করে কি জান? খাওয়ার জন্যে পিঁপড়ের শুককীটরা যেভাবে হ্যাংলাপনা করে, কাঁচ পোকার সেই শুককীটরাও ঠিক ওইভাবে হ্যাংলাপনা

শিবনাথ শাস্ত্রী তখন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার। সেই সময়েই খোদাই নামে একটি চাকর তাঁর বাড়িতে বহাল হল। চমৎকার মানুষ খোদাই। খুব বিশ্বাসী লোক।

ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী এলেন হেয়ার স্কুলে। তারপর কঠিন অসুখে পড়লেন। কাজ থেকে আধা-মাইনেতে বিদায় নিতে হল।

খোদাইকে নিয়ে ভাবনা হল শিবনাথের। সত্যি, অবস্থা এমন যে খোদাইয়ের মাইনে চালানো তখন শিবনাথের অসাধ্য। আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে শিবনাথ পরামর্শ করলেন। ঠিক হল যতদিন শিবনাথ সুস্থ হয়ে না ওঠেন, খোদাই ততদিন আনন্দমোহনের বাড়িতে চাকরি করবে।

খোদাই চলে গেল আনন্দমোহনের বাড়িতে।

এদিকে শিবনাথের অসুখ বেড়ে গেছে। খোদাই একদিন সকালে এসে উপস্থিত।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন—কি খোদাই, তুমি যে চলে এলে?

খোদাই বলল—আপনার বেমারি বেড়েছে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না, কাজ ছেড়ে এসেছি।

শিবনাথ বললেন—ভালো কাজ করোনি। তোমাকে খেতে দেবে কে?

খোদাই বলল—আপনি ভাববেন না আমি মাইনে চাই না। নারায়ণ আপনাকে বাঁচিয়ে তুললে পর আপনি হিসেব করে আমার মাইনে দেবেন। আর আপনি যদি না ওঠেন, মাইনেয় আমার দরকার নেই।

খোদাইয়ের কথা শুনে শিবনাথের চোখে জল এসে গেল। কিছুতেই খোদাইকে ফিরিয়ে দেওয়া গেল না। খোদাই শিবনাথের বাড়িতে থেকে গেল।

দিনের পর দিন যায়। শিবনাথ রোগশয্যায়। শিবনাথের কাছে কেউ সংসার খরচের টাকা চায় না। খোদাই টাকা এনেছে; নিজের গলার সোনার দানা বন্ধক রেখে টাকা এনেছে। শিবনাথের স্ত্রীকে সে সময়ে খোদাই

সমরজিৎ কর

শুরু করে দেয়। পিঁপড়েরা তাদের মুখের ডগা কিংবা শুঁড় দিয়ে স্পর্শ করলেই ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। পিঁপড়ের শুককীটের অনুকরণ করে তারা পিঁপড়ের মুখ স্পর্শ করার চেষ্টা করে। আর একবার যদি পিঁপড়ের ঠোঁটের কাছে পৌঁছল তো কাজ ফতে। পিঁপড়ে ভাবল, এ বুঝি তার নিজের বাচ্চ রই মুখ। আর যেই ভাবা, অমনি এক ফোঁটা খাবার ওই শুককীটের মুখে সে পুরে দেয়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কাচ পোকার শুককীটরা হ্যাংলাপনায় যেন ওস্তাদ। পিঁপড়ের শুককীটরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেই পারে না। ফলে বেশির ভাগ খাবার তাদের মুখে গিয়েই পড়ে। মাঝখান থেকে ব্যাচারা পিঁপড়ের শুককীটরা মরে শুকিয়ে।

হয়ত প্রশ্ন করবে, এটা কেমন হোল? পিঁপড়ের শুককীটরা যদি না খেয়ে মারাই যায়, তাহলে তো পিঁপড়েই থাকত না আর?

ঠিক কথা।

কিন্তু ব্যাপার কি জানো? অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। ধাক্কা মেরে পিঁপড়ের শুককীটদের সরিয়ে দিয়ে পিঁপড়ের মুখের খাবার কেড়ে খেলে হবে কি? কাঁচ পোকার শুককীটরা এত লোভী, ওরা নিজেরাই নিজেদের খেতে শুরু করে। অথচ পিঁপড়ের শুককীটরা এ সবের মধ্যে নেই। তাই অল্প দিনের মধ্যেই কাঁচ পোকার শুককীটরা সাবাড় হয়ে যায়। অথচ পিঁপড়েরা বেশ বড় সড় হয়ে সবাই মিলে বেঁচে ওঠে।

শুধু শুককীটই নয়। কাঁচ পোকারাও কখনও কখনও পিঁপড়ের আস্তানায় গিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসে দিন কাটায়। তখন পিঁপড়েরা খাবার সংগ্রহ করে আনে। আর কাঁচ পোকারা সেই খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথম দিকে পিঁপড়ের সঙ্গে ভাব করাটা কিন্তু একটু শক্ত কাজ।

কি করে তারা এর জন্যে, জানো?

যে পিঁপড়ের ঘরে তারা বাস করতে আসে তার নাম মিরমাইকা। ভারী চালাক পিঁপড়ে। একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁচপোকাদের সাবাড় করে। তাই এদের বেলায় কাঁচপোকাদের অনেক সাবধান হতে হয়।

প্রথমে করে কি, গুঁটি শুঁটি মেরে ওরা এগিয়ে যায় পিঁপড়ের কাছাকাছি। কাছে গিয়ে কাঁচ পোকা তার শুঁড় দিয়ে খুব আস্তে করে পিঁপড়ের গা স্পর্শ করে। তারপর পেটের ডগার দিকটা তুলে ধরে ঠিক তার মুখের কাছ বরাবর। পেটের ডগা থেকে তখন বেরিয়ে আসে এক ধরনের রস। পিঁপড়ে তখন ওই রস খেতে শুরু করে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে পিঁপড়ের ভেতর থেকে আক্রমণের ভাবটা খানিকটা কেটে যায়। এরপর কাঁচপোকার পেটের দুপাশ বরাবর বেরোতে থাকে আরও বেশ কয়েক রকমের রস। পিঁপড়েও ধীরে ধীরে এই রসগুলি রসিয়ে খেয়ে নেয়। আর তারপরই হয় ভাব।

কাঁচপোকা এবার তার পেটটিকে নামিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েও তাকে জড়িয়ে ধরে বয়ে নিয়ে যায় তার বৈঠকখানায়।

ব্যাপারখানা একবার দেখ। পিঁপড়ে ভাবল মস্ত একখানা কাজ করল বটে। কাঁচপোকার গা থেকে চেটেপুঁছে মিষ্টি রস খেয়ে ভাবল, না জানি আরও কত রসই না খাবে। ভবিষ্যতে আরও রস খাওয়ার লোভে কাঁচপোকাকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে তুলল।

আর কাঁচপোকা? তারও লাভ কম নয়? সেও হয়ত পিঁপড়ের ঘরে গিয়ে একটু আধটু কিছু পাবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কি হবে, বলা শক্ত। পিঁপড়ের আদরে ব্যাচারা খুনও হয়ে যেতে পারে।

পিঁপড়ের অতিথি সেবার আরও কত গল্পই না শোনা যায়। শুনে মনে হয় চালাকীতে ওরাও কি কম দড়?

বলেছে—মা, বাবুকে এখন বিরক্ত করো না। টাকা না থাকলে আমাকে বলো।

২

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার মধ্যে থেমে পড়লেন রামতনু লাহিড়ী। যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছেন, এমনি-ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর হাত ধরে রামতনু চট করে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লেন, তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলেন।

ষণ্ডামার্কা কেউ পিছু নিয়েছে নাকি? মারধোর করবে? নাকি, আরও সাংঘাতিক কিছু?

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কেউ কি আপনাকে তাড়া করেছিল?

রামতনু বললেন—না, না, আমাকে কেউ তাড়া করেনি। রাস্তায় আপনি একজন অন্যমনস্ক ভদ্রলোককে দেখতে পাননি? প্রায় আমার সামনাসামনি পড়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, দেখতে পাননি?

কে সেই অন্যমনস্ক ভদ্রলোক? যিনিই হোন, তাঁকে দেখে অমন হন্তদন্ত হয়ে রামতনুর পালানোর দরকার কি? রামতনু কি তাঁর কাছে টাকা ধার করেছিলেন, তারপর শোধ দিতে পারেননি সময়মতো?

রামতনু ব্যাখ্যা করে বললেন—আমার সামনে পড়লে উনি নির্ঘাত লজ্জা পেতেন, হয়তো মিথ্যে করে বলতেন, 'এই অমুকের কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, সেটা পেলেই আপনার দেনা শোধ করে দেব, এই কাল দেব ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমার সামনে পড়লে ওঁর মুখখানা এমন শুকিয়ে যায় যে দেখলে আমার ভারি কষ্ট হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ উনি আমাকে দেখবার আগেই আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি।

কিন্তু না পালিয়ে যদি রামতনু ওই ভদ্রলোককে মকুফ করে দেন, তাহলে তো আর কোনও দুর্ভাবনা থাকে না। রামতনু সেটা করলে পারেন না?

না, তাও হয় না। এ-বিষয়ে রামতনু বললেন—যদি বলি, 'ও-টাকা আপনাকে আর দিতে হবে না, তাহলে উনি ভাববেন আমি ওঁকে ভিক্ষে দিয়েছি, উনি আরও লজ্জা পাবেন। না, আমার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই।

তাজব চিড়িয়াখানা

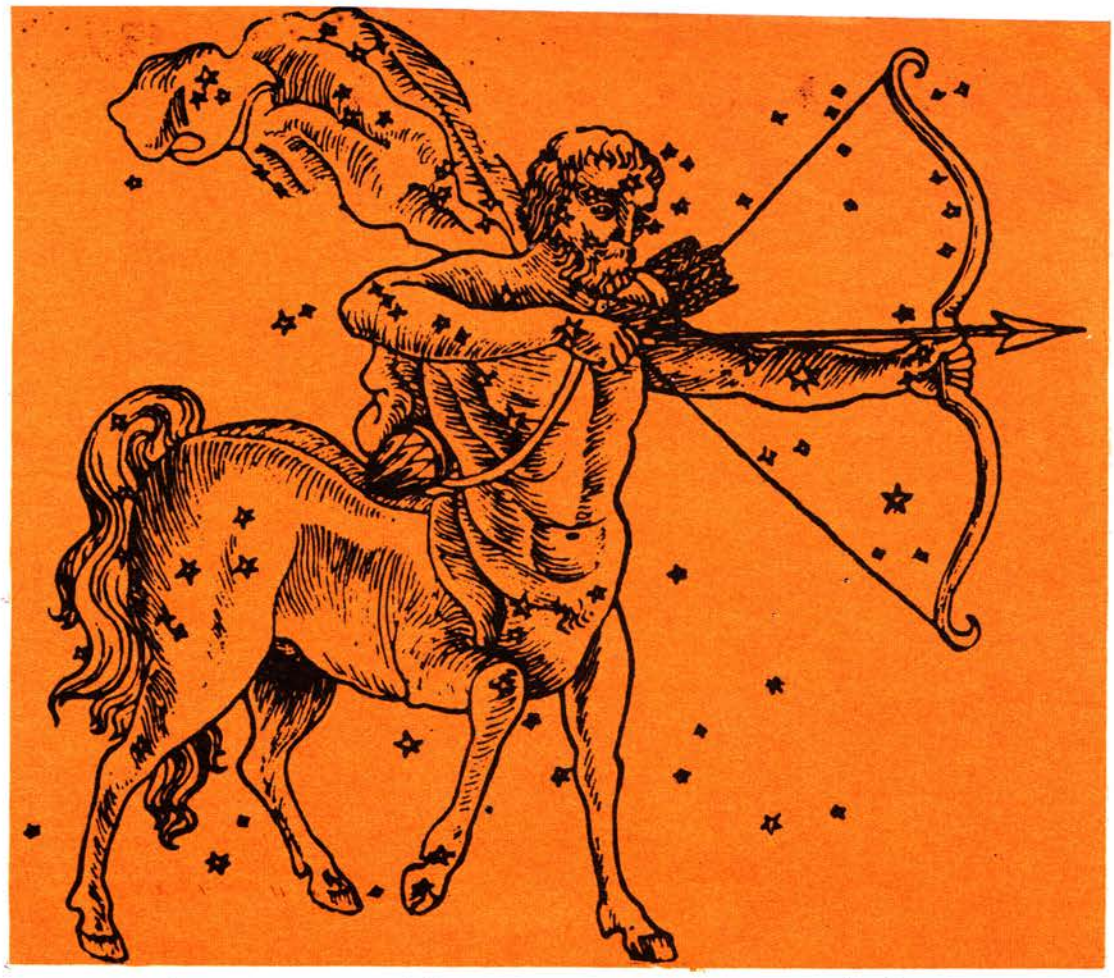

অর্ধেক তার মানুষের মতো, বাকি অর্ধেক ঘোড়ার মতো। এই ঘোড়া-মানুষ দেখেছ কেউ? না, কোনও রাজার ঘোড়াশালে তার দেখা মিলবে না। কোন চিড়িয়াখানায়ও না। আমাদের কবি সুকুমার রায় হাঁস আর সজারু মিলিয়ে গড়েছিলেন—'হাঁসজারু'। বক আর কচ্ছপ মিলিয়ে—'বকচ্ছপ'। কিন্তু ঘোড়া-মানুষ নাকি মোটেই সেধরনের কোনও মনগড়া প্রাণী নয়। একসময় নাকি সত্যিই দলে দলে ঘুরে বেড়াতো তারা। মানুষেরা নাম দিয়েছিল তাদের —সেনটোর। ঘোড়ার মতো চারটে পা তাদের, আবার মানুষের মতো দু'খানা হাত

এই ঘোড়া-মানুষদের আস্তানা ছিল পুরানো দিনের গ্রীসে। গ্রীসের থেসালি বলে একটা এলাকায়। সেখানকার বনে আর পাহাড়ে তারা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো। নাচ গান হল্লা করতো। কখনও বা তুমুল লড়াই। কিন্তু চিরকাল কি আর একভাবে চলে? একবার তারা লড়াই বাধিয়ে বসলো গ্রীকদের সঙ্গে। আর যায় কোথা? গ্রীকদের প্রিয় নায়ক হেরাক্লিস এগিয়ে গেলেন তাদের বিরুদ্ধে। মস্ত বীর তিনি। রোমানরা তাঁকেই বলে হারকিউলিস। সুতরাং বুঝতেই পারছো। তিনি ঘোড়া-মানুষদের মারতে মারতে একেবারে শেষ করে দিলেন। বেঁচে রইলো মাত্র দু'চারজন। ঘোড়া মানুষদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী গুণী একমাত্র তাঁদেরই খাতির করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি। গ্রীকদের সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব হয়ে গেল তাঁদের। মানুষের সঙ্গে এত গলাগলি ভাব, দেখে কে বলবে, ওরা ঠিক মানুষ নয়. ঘোড়া-মানুষ!

কত কাণ্ড এই ঘোড়া-মানুষদের নিয়ে। তাদের ছবি আঁকা হয়েছে। মূর্তি গড়া হয়েছে। দিস্তা দিস্তা লেখা হয়েছে তাদের নিয়ে। তবু সকলে কিন্তু বিশ্বাস করেনা—এক সময় সত্যিই ঘোড়া-মানুষ ছিল পৃথিবীতে। অনেক, অনেকদিন আগে একজন গ্রীক পণ্ডিতই বলেছিলেন—এসব স্রেফ বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

তাহলে এই ঘোড়া-মানুষের কথা এলো কোথা থেকে? সে একটা প্রশ্ন বটে। কেউ কেউ মনে করেন--ঘোড়া-মানুষরা আসলে মানুষই। এমন মানুষ যাদের প্রতীক ছিল ঘোড়া। কিংবা তারা ঘোড়ার পুজো করতো। অন্যরা বলেন—আসলে ওদের ঘোড়া-মানুষ বলা হতো ওদের স্বভাবের জন্য। মানুষ হলেও ওরা ছিল বন্য।

সেটা কিন্তু হতে পারে। যেমন আমাদের দেশের রাক্ষস কিংবা অসুর। ওরা তো আসলে মানুষই। স্বভাবের জন্যই তারা অন্যদের চোখে রাক্ষস কিংবা অসুর।,

এখানেই শেষ নয়। কারও কারও মতে ঘোড়া-মানুষ আসলে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার মানুষের দল। এখনও ঘোড়সওয়ারকে কিন্তু পশ্চিমে বলা হয় —হর্সম্যান; যেন মানুষ এবং ঘোড়া আলাদা নয়, দুইয়ে মিলে এক। যারা আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি তারা যদি হঠাৎ দেখে টগবগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ধুলোর মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে যোদ্ধার দল তবে কি ভাববে তারা? নিশ্চয় ছুটতে ছুটতে গিয়ে নিজেদের সর্দারকে বলবে—এবার আর রক্ষা নেই। অদ্ভুত একদল লড়িয়ে আসছে। তারা না মানুষ, না জন্তু। এ-কাণ্ড ঘটেছে একালেও। ঘোড়ার পিঠে বসা ইউরোপীয় আগন্তুকদের দেখে আমেরিকার আদিবাসীদের সে কি দৌড়! কে জানে হয়তো এমনি করেই একদিন ভয়ে ছুটতে ছুটতে আর পিছু তাকাতে তাকাতে একদিন আদ্যিকালের গ্রীকরা দেখেছিল প্রথম ঘোড়া-মানুষ,—'সেনটোর'!

বহুরূপী

আমরা রামধনু কেন দেখি

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে যে দিকেই চোখ মেলে তাকাও, দেখবে আলো। শুধু আলো, আলো আর আলো : আকাশে আলো, গাছের পাতায় আলো, নদীর ঢেউ-এ আলো—চারিদিকে শুধু আলো। কিন্তু হঠাৎ যদি প্রশ্ন ওঠে, 'আলো কি?' —তাহলে নিশ্চয়ই বেশ অসুবিধায় পড়ে যাবে : ভাবতে ভাবতে এত পরিচিত আলোকেও হয়ত অনেক অচেনা বলে মনে হবে। না, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। যে আলো অবিরাম পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ছে, স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ তার আসল চেহারাটা আবিষ্কার করতে চেয়েছে। কত চিন্তাশীল মানুষ সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এই চিন্তায়! এমন কি নিউটন, আইনস্টাইনের মত দিকপাল বিজ্ঞানীরাও আলো সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়েছেন, আর তাঁদের অমূল্য চিন্তার ফসল জমা পড়েছে বিজ্ঞানের ভাঁড়ারে। জ্ঞানের আলোয় মানুষ আলোকে আজ নতুনভাবে চিনেছে।

তা সে বিজ্ঞান যাই বলুক, 'আলো' বলতে আমরাও তো কিছু একটা বুঝি। 'আলো' বলতে আমরা কি বুঝি? খুব সহজ কথায় বললে, 'আলো' বলতে আমরা এমন একটা কিছুকেই বুঝি, যা কোনো জিনিষের ওপর এসে পড়লে আমরা জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্ধকার ঘরের জানলা খুলে দাও, আলো এসে পড়বে ; আর স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঘরের প্রতিটি জিনিস। এই হল আলোর ধর্ম। আমাদের চোখে আলোকে আমরা এই-ভাবেই জানি। কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে আলোর সংজ্ঞাটা আরো একটু ব্যাপক ; যেমন ধরো আমরা যাকে তাপ বলি, বিজ্ঞান তাকেও আলো বলে। শুধু তাপই নয়, এমন আরো অনেকরকম আলো বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়েছে, যা আমাদের সাধারণ চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, তাহলে বিজ্ঞান তাকে আলো বলবে কেন? বিজ্ঞানের তো আর সত্যি সত্যি চোখ নেই।

না, তা অবশ্য নেই। তবে বিজ্ঞানের আছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, আর তার ফলেই বিজ্ঞান এমন সব আলোর সন্ধান পেয়েছে, যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এইরকম একটা পরীক্ষার কথা তোমরা হয়তো অনেকেই জান। সূর্যের আলো বিশ্লেষণের পরীক্ষার কথাই আমি বলছি। জানলার ছিদ্র দিয়ে আলো এসে ঘরে ঢুকেছে। বিজ্ঞানী তার সামনে একটি ত্রিকোণ কাঁচের টুকরো তুলে ধরলেন। ত্রিকোণ এই কাঁচটির বৈজ্ঞানিক নাম প্রিজম্। আলোর সামনে এই প্রিজমটা তুলে ধরলে বিজ্ঞানী দেখতে পাবেন—ঐ কাঁচটার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সূর্যের আলোর এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে, আর তার ফলে সাদা আলোর বদলে দেওয়ালের গায়ে রামধনুর মত সারি সারি সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর ফালি ফুটে ওঠে। একে বলে 'বর্ণালী'। আকাশে যে রামধনু ওঠে, ঠিক তারই মত বর্ণালীতেও প্রথমে থাকে বেগুনী রঙ, তারপর নীল, তারপর আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং সবশেষে থাকে লাল রঙ। রামধনুর সঙ্গে বর্ণালীর তফাৎ হল—রামধনু ওঠে আকাশের গায়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে, আর বর্ণালী ফুটে ওঠে পরীক্ষাগারে—দেওয়ালের গায়ে কিংবা সাদা পর্দার ওপর, আর তার রঙের ফিতেগুলো বাঁকা নয়—পুরোপুরি সোজা।

এটা কি ভাবে হয়? এত রঙ কোথা থেকে আসে? তোমরা হয়ত ভাবছো কাঁচটার থেকেই এই সব রঙবেরঙের আলো বেরিয়ে এসেছে ; ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। ছেলেবেলায় আমারও প্রথমে মনে হয়েছিল যে, এটা বোধহয় ঐ প্রিজমটারই কারসাজি ; কিন্তু বিজ্ঞানের বই পড়ে ধারনাটা এখন একেবারে পাল্টে গেছে। ব্যাপারটা আসলে একটু অন্যরকম। রঙগুলো ঐ সূর্যের আলোর মধ্যেই মিশে ছিল : প্রিজম্ তাদের আলাদা করে দিয়েছে মাত্র। তার কারসাজি শুধু ঐটুকুই। যেমন স্কুলে যাবার পথে ছেলেরা থাকে মিলে মিশে। তখন, কে ক্লাস ফাইভের ছেলে আর কে ক্লাস সেভেনের—তা আলাদা ভাবে বুঝে ওঠা কঠিন ; কিন্তু স্কুলের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই ছেলেরা যে যার শ্রেণী অনুসারে নিজেরাই আলাদা হয়ে যায়। বড় ছেলেরা যায় উঁচু ক্লাসের দিকে আর শিশু-শ্রেণীর দিকে চলে যায় সবচেয়ে ছোট ছোট শিশুর দলটি। যারা একসঙ্গে মিশে ছিল তাদের আর আলাদাভাবে চিনতে কষ্ট হয় না।

তাহলে কি বিভিন্ন রঙের আলোর মধ্যেও এরকম শ্রেণী বিভাগ আছে? কিন্তু কথা হল, আলোরা তো আর ছেলেদের মত ইস্কুলে পড়ে না! তাহলে তাদের শ্রেণী-বিভাগটা হবে কি করে?

এটা বুঝতে গেলে, আলো কি—সেটা আগে জানা দরকার। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং আলোর আচার-আচরণ লক্ষ্য করে এক সময় বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল যে, আলো আসলে এক রকমের ঢেউ। আমরা জানি নদীতে বা সমুদ্রে যে ঢেউ ওঠে, সে ঢেউ হল জলের ঢেউ। শব্দ যে বাতাসের ঢেউ, বৈজ্ঞানিকরা তাও জানতেন। কিন্তু প্রশ্ন হল আলো কোন্

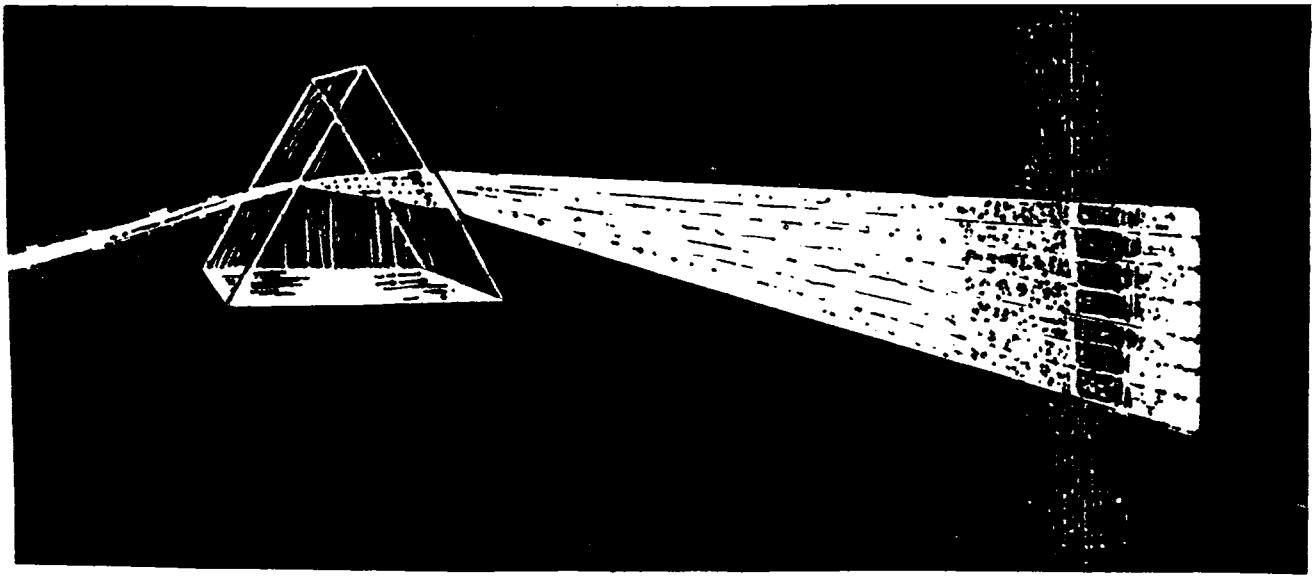

বাঁদিকের ছিদ্র দিয়ে সূর্য রশ্মি এসে পড়ছে ত্রিকোণ কাঁচের ওপর এবং ডান দিকে পর্দার ওপর ফুটে উঠছে সাত রঙের বর্ণালী। সবচেয়ে নীচের দিকে থাকবে বেগুনী রঙ, তারপর নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং সবচেয়ে ওপরে লাল রঙ। এই সব রঙের নাম-গুলোর প্রথম অক্ষরগুলো পর পর সাজালে হয়, 'বেনীআসহকলা'। ইংরেজীতে VIBGYOR' (violet, indigo, blue, green, yellow orange এবং RED শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো পর পর সাজিয়ে)। এইভাবে একটা মাত্র শব্দ মনে রেখে রামধনুর সাতটা রঙের শ্রেণী বিন্যাস মনে রাখা সহজ হয়।

সমুদ্রের ঢেউ। পৃথিবীর মাত্র একশো মাইল ওপরে বায়ু-সমুদ্র খুব পাতলা হয়ে ক্রমশঃ শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। তাহলে কোন্ সমুদ্র পার হয়ে কোটি কোটি মাইল দূরের তারার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোচ্ছে? বিজ্ঞানীরা কল্পনা করলেন, যাকে শূন্য বলে মনে হয়, তা আসলে সত্যি সত্যিই শূন্য নয়। তাঁরা বললেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একটা অদ্ভুত সমুদ্রে ডুবে আছে, আর আলো হচ্ছে এই সমুদ্রের ঢেউ। এই সমুদ্রে জল নেই, হাওয়াও নেই, আছে ইথার নামে এমন একটা জিনিস, যা ঐ বিরাট আকাশটার প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে। বায়ুর তরঙ্গ আমাদের কানের পর্দায় এসে আঘাত করলে আমরা শব্দ শুনতে পাই, আর ইথার-তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে লাগলে আমরা দেখতে পাই। শব্দের যেমন রকমফের আছে—কোনোটা সরু, কোনোটা মোটা, আলোরও তেমনি নানান রঙ আছে। লাল আলোর সঙ্গে বেগুনী আলোর তফাৎ শুধু একটাই : লাল আলোর ঢেউ-গুলো বেগুনী আলোর ঢেউএর চেয়ে অনেক বড়। নদীর ঢেউএর সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউএর যা তফাৎ। আমরা যে আলো দেখতে পাই, বেগুনী আলোর ঢেউএর দৈর্ঘ্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম। আসমানী আলোর তরঙ্গ তার চেয়ে একটু বড়। নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরো একটু বড়; এইভাবে ক্রমশঃ সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একটু একটু করে বেড়ে গেছে।

এখন স্বভাবতঃই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে যে, এমন সব আলো থাকতে পারে কিনা, যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়েও বেশী অথবা বেগুনী আলোর চেয়েও কম?

প্রশ্নটা খুব সুন্দর। অনেকদিন আগে হার্শেল নামে একজন বৈজ্ঞানিকও এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছিলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষাটা আর কিছুই না; বর্ণালীর সাতটা রঙ যে পর্দার ওপর পড়েছে, তার বিভিন্ন জায়গায় তিনি অনেকগুলো থার্মোমিটার আটকে দিলেন এবং এর ফলে যা দেখা গেল তাতে তিনি বেশ অবাক হলেন। তিনি দেখলেন বর্ণালী যত লাল আলোর দিকে এগোচ্ছে, উত্তাপও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে; আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, লাল আলোর এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরেই উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী। হার্শেল এই পরীক্ষার থেকে সিদ্ধান্ত করলেন যে, বর্ণালীর লাল আলোর পরে রয়েছে অদৃশ্য তাপ-রশ্মির এলাকা। আর, লাল আলোরও পরে যেহেতু এর অবস্থান, এটা সহজেই বোঝা গেল যে, তাপ-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল আলোর চেয়েও বেশী। এই জন্য এর নাম দেওয়া হল ইন্‌ফ্রা রেড্ রে বা লাল-উজানী আলো।

হার্শেলের পরীক্ষার ফলাফল দেখে বিজ্ঞানীরা স্বভাবতঃই বর্ণালীর বেগুনী পারের এলাকা সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। অনুসন্ধানের ফলও কিছু-দিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। উইলিয়াম রিটার নামে একজন বৈজ্ঞানিক শেষ পর্যন্ত বেগুনী-পারের আলো বা আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সন্ধান পেলেন। এই আলো তাপ উৎপন্ন করে না; কিন্তু দেখা গেল, ক্যামেরায় এর ছবি তোলা যায়। বর্ণালীতে এর অবস্থান দেখে এও বোঝা গেল যে, এই আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগুনী আলোর চেয়েও আরো ছোট।

এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন যে, আলট্রা-ভায়োলেটের চেয়েও ছোট এবং ইনফ্রা রেড রে'র চেয়েও বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো থাকা অসম্ভব নয়। পরবর্তীকালে উন্নত ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এরকম সব আলোর সন্ধান সত্যিই পাওয়া গেছে। তোমরা নিশ্চয় একস্-রে বা রঞ্জন রশ্মির নাম শুনেছো; এই রশ্মি মানুষের শরীর ভেদ করে চলে যেতে পারে এবং সেই জন্য শরীরের মধ্যে কোনো হাড় ভেঙে গেলে বা জখম হলে, এই রশ্মির সাহায্যে ডাক্তারেরা ঐ হাড়ের ছবি তুলে নেন এবং ছবি দেখে, রোগীর অবস্থা বুঝে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। যাই হ'ক, এই রঞ্জন রশ্মিও একরকমের আলো, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগুনী পারের আলোর চেয়েও কম। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ধাতুকে তেজস্ক্রিয় ধাতু বলা হয়। কারণ এইসব ধাতু সব সময় অদৃশ্য তেজ বা আলো বিকিরণ করছে। এই অতি শক্তিশালী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রঞ্জন রশ্মির চেয়েও ছোট এবং এর নাম গামা রশ্মি।

ওদিকে লাল উজানী আলোর ওপারেও আলোর সন্ধান পাওয়া গেছে, যার নাম বেতার-তরঙ্গ। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য লাল উজানী আলোর থেকেও বেশী এবং এই তরঙ্গ যে কোনো বাধা অতিক্রম করে দূর দূরান্তরে চলে যেতে পারে। বেতার-তরঙ্গের এই প্রেরক কেন্দ্র থেকে বেতার-তরঙ্গকে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, আর মুহূর্তের মধ্যে সেই তরঙ্গ মানুষের কথাবার্তা, খবরাখবর পৌঁছে দেয় দেশে দেশান্তরে।

আচ্ছা, তা যেন হ'ল। কিন্তু ঐ সাতরঙা বর্ণালীর কথা শুনে কি তোমাদের মনে হচ্ছে যে, রামধনুর ব্যাপারটাও অনেকটা ঐরকমই কিছু একটা হবে? সত্যিই তাই! দু'টো ব্যাপার অনেকটা এক রকমেরই বটে, তবে রামধনুর বর্ণালীর উৎপত্তি ত্রিকোণ কাঁচ থেকে নয়, হাওয়ায় ভাসমান ছোট ছোট জলকণা থেকে। ছোট্ট ছোট্ট জলকণার মধ্যে সূর্যের আলো ঢুকে, তারপর বিপরীত দিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে আসে; কিন্তু ভেতরে ঢুকবার সময়, আর বাইরে বেরিয়ে আসবার সময় বিভিন্ন রঙের দিক পরিবর্তনটা হয় ভিন্ন ভিন্ন রকম। লাল রঙের দিক পরিবর্তন হয় সবচেয়ে কম, আর বেগুনী রঙের সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য রঙগুলো এই দুই রঙের মাঝামাঝি দিক বেছে নেয় এবং বর্ণালীর ক্রম অনুসারে এই রঙগুলো সাজানো থাকে।

এখন একটা দরকারী কথা হল, সূর্যের আলো জলকনার ভেতরে একবার ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে আসার পর একটা দিক বিচ্যুতি হয়, এবং বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখেছেন যে, সূর্য রশ্মির সাত রঙে ভেঙে যাওয়াটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তখনই, যখন আপতিত সূর্যরশ্মি আর জলকণা থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট কোণ্ রচিত হয়। এই দরকারী কথাটা একবার জানা হয়ে গেলে, তারপর নেহাৎ সাদামাটা জ্যামিতির জ্ঞান কাজে লাগিয়েই বোঝা যায় যে, এই সব জলকণা, যারা সূর্য রশ্মিকে ঐ নির্দিষ্ট কোণে আমাদের চোখের দিকে ফিরিয়ে দেয়, তারা আকাশের গায়ে একটা সাত রঙা বর্ণালীর বৃত্ত রচনা করে। আর এই হ'ল রামধনু।

আলো সম্বন্ধে তোমরা এতক্ষণ অনেক কিছুই শুনলে; কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়—বরং গোড়ার কথা। আলো যে আসলে এক ধরনের ঢেউ, এই মতবাদ অনেক পুরোণো কিন্তু এর পাশাপাশি আরেকটা মতবাদও টিকে ছিল, যাতে আলোকে খুব ছোট ছোট কণিকার স্রোত ব'লে বর্ণনা করা হয়েছিল। মুস্কিলের কথাটা হচ্ছে এই যে, দুটো মতবাদের কোনোটাকেই পুরোপুরি বাদ দেওয়া চলে না। কথাটা শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই অবাক লাগছে? আচ্ছা, আরেকটু বুঝিয়ে বলছি। শোনো।

বিজ্ঞানীরা আলোর ওপর নিত্য নতুন পরীক্ষা চালিয়ে, আলো সম্বন্ধে যতই জানছিলেন, ততই অবাক হচ্ছিলেন; কেন না আলোর কতকগুলো আচরণ দেখে তাঁরা যখন ভাবলেন যে, আলো আসলে ইথার তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না, ঠিক তখনই হয়ত আরেকটা পরীক্ষার ফলাফল তাদের সমস্ত ধারণাকে উল্টেপাল্টে দিয়ে রায় দিল আলোক-কণিকাবাদের স্বপক্ষে। সহজ কথায়, আলোর আচরণের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না; কখনো মনে হচ্ছিল আলো এক ঝাঁক কণিকার স্রোত, আবার কখনো মনে হচ্ছিল সে বুঝি ইথার-সমুদ্রে দ্রুতগতি ঢেউ।

সে যাই হ'ক, এদিকে একটা মুস্কিল হ'ল এই যে, অনেক খোঁজ খবর, অনুসন্ধান করেও কিন্তু ইথারের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। কাজেই বৈজ্ঞানিকেরা স্বাভাবিক ভাবেই ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ক্রমশঃই সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন; আর এমনি যখন অবস্থা, ঠিক তখনই ম্যাক্সওয়েল নামে একজন বিজ্ঞানী অঙ্ক কষে এক অসাধারণ তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেন। বিদ্যুৎ আর চৌম্বক-বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলোকে একত্রিত ক'রে গাণিতিক পদ্ধতিতে তিনি দেখালেন যে, একটা বৈদ্যুতিক আধান বা ইলেকট্রিক চার্জ যদি দ্রুত কাঁপতে থাকে, তাহলে সে আলো বিকিরণ করবে। এর থেকে সবচেয়ে দরকারী যে কথাটা জানা গেল তা হচ্ছে এই যে, আলো আসলে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ আর চৌম্বক প্রাবল্যের ঢেউ; সুতরাং এর জন্য ইথারের মত কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করে নেবার প্রয়োজন আর রইল না। বিজ্ঞানীরাও ইথারের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু তরঙ্গবাদ আর কণিকাবাদের দ্বন্দ্বটা তবু থেকেই গেল।

যাই হ'ক, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ম্যাক্সপ্লাঙ্ক অবশেষে পথ দেখালেন। তিনি যে তত্ত্বের প্রবর্তন করলেন, তার নাম কোয়ান্টাম তত্ত্ব। আমাদের এই ছোট আলোচনার শেষে, এখন আমরা খুব সহজ করে এই তত্ত্বকে বুঝবার চেষ্টা করবো। মজার কথা হল, এই মতবাদে আলোর তরঙ্গ-ধর্মকেও স্বীকার করা হয়েছে, আবার কণিকাবাদকে বাতিল করা হয়নি; আসলে এই দুটো মতবাদকে জুড়ে দিয়েই তৈরী হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্বের চোখ দিয়ে দেখলে আলোর ঢেউ তুলে চলাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু সে ঢেউ জলের ঢেউ-এর মত ছেদহীন ভাবে একটানা বয়ে চলে না। এই ঢেউ-এর স্বভাবই হ'ল ছোট ছোট, টুকরো টুকরো হয়ে বয়ে চলা। এক একটা টুকরো যেন এক একটা তরঙ্গের প্যাকেট, যার বৈজ্ঞানিক নাম কোয়ান্টাম। আলোকে এই রকমভাবে চিন্তা করলে একটা মস্ত সুবিধে হল এই যে, এক ঝাঁক কোয়ান্টামকে এক ঝাঁক কণিকার স্রোত হিসেবেও ভাবা যায়, আবার তাকে তরঙ্গ হিসেবে ভাবলেও অসুবিধা নেই। সুতরাং আলো যদি কখনো তরঙ্গের মত, আবার কখনো কণিকার মত আচরণ করে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তোমরা এখন ছোট আছো; তাই ছোট্ট করেই বললাম—আলোর কথা। অনেক বড় হয়ে তোমরা যখন বিজ্ঞানের আরো গভীরে যাবে তখন দেখবে কোথাও অন্ধকার নেই; আলোর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাও সেদিন আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে॥

হকি খেলার জন্ম কথা

মুকুল

হকি খেলায় ভারত আবার বিশ্বজয়ী হয়েছে বিশ্বকাপ জয় করে। এক সময় ভারতই ছিল বিশ্ব-হকির অজেয় যোদ্ধা। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত টানা ছয়টি অলিম্পিকে পেয়েছিল হকির স্বর্ণপদক। অলিম্পিকের এক একটি আসর বসে ৪ বছরের ব্যবধানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য যদি দুটি অলিম্পিক বন্ধ না থাকত তাহলে টানা ৮টি অলিম্পিকেই ভারত জয়ের মালা পরত। সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করে ১১ জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গড়লে সে দলকেও হয়তো হেলায় হারাতে পারত। তখন হকি খেলায় ভারত ছিল এত শক্তিশালী।

শুধু শক্তিই নয়, খেলাও ছিল অপরূপ সুন্দর। হাতে ছিল শিল্পীর দক্ষতা, পেলব কব্জির কারিগরি। হকি স্টিক যেন ছিল হাতের যাদুদণ্ড। স্টিকের ছোট ছোট টানে, বলে স্টিকের যাদুস্পর্শে, বিপক্ষকে নাচাতে পারত। তাই ধ্যানচাঁদকে বলা হত যাদুকর। রূপ সিং, অ্যালেন, কার, ট্যাপসেল, জাফর দারা, লাল শাহ বোখারী, জয়পাল সিং, বাবু প্রভৃতি খেলোয়াড়রা হয়ে উঠেছিলেন রূপকথার রাজপুত্তুর। এর প্রমাণ রয়েছে বিদেশের পত্র-পত্রিকায়, মুখের কথায়।

১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ধ্যানচাঁদের খেলা দেখে জার্মানরা বলেছিল, ধ্যানচাঁদ তো খেলোয়াড় নয়, অ্যাঞ্জেল। অর্থাৎ দেবদূত। অথচ ধ্যানচাঁদের গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মত কালো। তাঁর সম্পর্কে ওই প্রশংসা খেলার রূপ-সৌন্দর্যের জন্যই তো।

১৯৩২ সালে ভারতীয় দল যখন লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে খেলতে গিয়েছিল তখন আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্রশংসার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকানরা তার আগে ভারতীয়দের খেলা দেখেনি। শুনেছিল হকি দুনিয়ায় ভারতীয়রাই রাজা। আর ভারতীয়দের এক একজনে দুই তিনটি করে বিয়ে করে। তারা এসেছে তাদের বৌদের নিয়ে।

আসলে দলের সঙ্গে কিন্তু দ্বিতীয় মহিলা ছিলেন না, একমাত্র ম্যানেজার জি ডি সোন্ধীর সহধর্মিনী ছাড়া। দলে দুটি সিংহ আছে লেখার অর্থ কি? ওটা কৌতুক। সিং পদবীধারী খেলোয়াড়দেরই সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। সিং পদবীধারী যে দুজন দলে ছিলেন তারা হচ্ছেন রূপ সিং ও গুরমিৎ সিং।

যাই হোক, বিশ্ব হকিতে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং খেলোয়াড়দের সম্পর্কে এই সব রূপকথা প্রচার হওয়ায় অনেকের ধারণা ছিল ভারতই হকির মাতৃভূমি। আমাদের দেশেই প্রথম হকি খেলা শুরু হয়েছিল। এখনো অনেকের সে ধারনা আছে।

আসলে অন্যান্য পাঁচরকমের খেলার মত আমাদের দেশেও হকি খেলা এসেছে ইংরেজদের মাধ্যমে এবং ইংলণ্ডে যখন হকি খেলার প্রসার প্রচার ভালভাবে শুরু হয়েছে সেই সময়ে, বিলিতি পল্টনের মারফতে। ভারতীয় ফৌজের ইংরেজ অফিসারদের কাছ থেকে প্রথমে খেলা শিখেছে ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়। পরে দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে খেলে হকিতে হাত পাকিয়েছে ভারতীয় সিপাইরা। বলা বাহুল্য, ভারতীয় দলের প্রথম বিদেশ সফরও সৈন্য দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৯২৬ সনে। গিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডে। এবং ওই সফরে সাফল্যের সুবাদেই আমাদের হকি খেলোয়াড়রা অলিম্পিকে যাবার আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

কিন্তু হকি খেলা সৃষ্টির ইতিহাস কি? কোথায় প্রথম খেলা আরম্ভ হয়েছিল? সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না।

আত্মরক্ষার জন্যই মানুষ একদিন হাতে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল। লাঠি, বর্শা, পাথরের চাই দিয়ে আদিমযুগের মানুষ বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করত। গোল আকারের কোন বস্তুকে হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করার মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবনতা আছে। কৌতুহল মেটাতেই হয়তো মানুষ একদিন গোলবস্তুকে হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করেছিল। তারপর তার মধ্যে পেয়েছিল বৈচিত্র্যের স্বাদ, খেলার আনন্দ।

মানুষ যত জোরে ছুটতে পারে তার চেয়েও বেশী জোরে কোন বস্তুকে ছোটাতে পারে হাত বা পা দিয়ে। আবার হাতিয়ার দিয়ে ছোটাতে পারে আরো অনেক জোরে। সম্ভবত গতি ও শক্তির এই সহজ সত্য এবং প্রক্রিয়ার আনন্দ থেকেই হকি, ক্রিকেট, গলফ্ প্রভৃতি খেলার সৃষ্টি।

হকি খেলার জন্মকথা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা ঠিকভাবে হদিস করতে পারেননি, পৃথিবীর কোন্ দেশে এবং কোন্ সময়ে এই খেলাটি প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। তবে দুশো, পাঁচশো, হাজার—এমনকি দু হাজার বছর আগেও যে এই খেলার প্রচলন ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে অবশ্য এক নিয়মে খেলা হয়নি। খেলার ধরণ এবং উপকরণও এক ছিল না। তবে সে সব খেলা যে হকিরই রকমফের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশে ইংরেজরা এই খেলা আমদানী করার আগে পাঞ্জাব অঞ্চলে হকি খেলার মত একরকম খেলার প্রচলন ছিল। কাপড় দিয়ে তৈরি শক্ত বল এবং বাঁকা লাঠি ছিল খেলার উপকরণ। খেলাটির নাম ছিল—'খিদ্দো খণ্ড'।

হকি পৃথিবীর প্রাচীন খেলাগুলির অন্যতম। এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও যে হকি খেলার প্রচলন ছিল তার প্রামাণ্য চিত্র রয়েছে কোপেনহেগেনের ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে। জার্মানির পুরা-তত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন খুঁজতে গিয়ে এথেন্স শহরের মাটি খুঁড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত অলিম্পিক স্টেডিয়ামের মধ্য থেকে ওই চিত্রটি আবিষ্কার করে-ছিলেন। শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করা হকি খেলার চিত্র। চিত্রটির রচয়িতা ভাস্কর থেমিস্টোক্লেস (Themistoctes)। রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৫১৪—৪৯৯ বলে উল্লেখ আছে। চিত্রের বিষয়বস্তু ৩ দুজন খেলোয়াড় মুখোমুখি কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে হকি বল নিয়ে 'বুলি' করছে। তবে বুলি করছে স্টিকের মাথা উপরের দিকে না রেখে উল্টোভাবে নিচের দিকে রেখে। আর কয়েকজন খেলোয়াড় হকি স্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুদিকে। ওই চিত্রই প্রমাণ করে খৃস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগেও হকি খেলার প্রচলন ছিল। এথেন্সের প্রাচীন মন্দিরের গায়েও হকি খেলার নানা চিত্র খোদাই করা আছে। যে কারণেই হোক হকি খেলা খৃষ্টজন্মের পর বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার নতুনভাবে আরম্ভ হয় বারো বা তেরো শতক থেকে।

ইংলণ্ডের ক্যাণ্টারবারি ক্যাথিড্রালের একটি জানলার কাঁচের উপর হকি খেলার এক চিত্র রয়েছে। একটি ছেলে হকিস্টিকের মত বাঁকা স্টিক দিয়ে বলে আঘাত করছে। ওটি ছয়শো-সাড়ে ছয়শো বছরের পুরনো চিত্র। ১৪৮৬ সনের কাছাকাছি নির্মিত ফ্রান্সের একটি তৈলচিত্রের সঙ্গেও আধুনিককালের হকি খেলার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

হকি খেলার মতই এক ধরনের খেলা নাকি আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা ছিল। সেটা একাদশ শতকের কথা। খেলাটির নাম ছিল হার্লে (Hurley) দ্বাদশ শতকে ওই ধরনেরই এক খেলা স্কটল্যাণ্ডে শিণ্টি (Shinty) নামে পরিচিত ছিল।

হাজার বছর ধরে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরাও এক ধরনের হকি খেলেছে, যাকে আসুরিক হকি বলা যেতে পারে। খেলা তো নয় বল আর লাঠি নিয়ে লাঠালাঠি। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দুই দলে বা দুই সম্প্রদায়ে সূর্যোদয় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বল আর স্টিক নিয়ে লড়াই। যার মধ্যে খুন-জখম ছিল সাধারণ ঘটনা।

হকি খেলা দুই রকমের। ফিল্ড হকি আর আইস হকি। মাঠের ঘাসের উপর যে হকি খেলা হয় তাকে বলে ফিল্ড হকি। বরফের উপর হকি খেলাকে বলা হয় আইস হকি। নিয়মকানুন এবং উপকরণে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তবে ফিল্ড হকি থেকেই আইস হকির উৎপত্তি, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ স্পোর্টস'-এর মতে।

রাশিয়ানরা আইস হকির ওস্তাদ। ওদেশে ফিল্ড হকির এখনো তেমন প্রসার ঘটেনি কিন্তু কয়েক শো বছর আগে নাকি তাজিকিস্থানে গুইবোজি (Guibozi) নামে এক ধরনের খেলার রেওয়াজ ছিল, যে খেলার ধরনধারন আধুনিক কালের ফিল্ড হকিরই অনুরূপ।

হকি খেলার অতীত সম্পর্কে উইয়ে-কাটা ছেঁড়া-পাতার লেখালেখি নিয়ে যারা প্রচুর গবেষণা করেছেন তাদের মতে প্রাচীন পারস্যই হকি খেলার মাতৃভূমি। বড় বড় বেড়াগাছের বাঁকানো ডাল দিয়ে পারস্যের অধিবাসীরা এই খেলা খেলত। ক্রমে পারস্য থেকে গ্রীসে, গ্রীস থেকে রোমে, রোম থেকে ফ্রান্সে খেলাটি ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে খেলাটিকে বলা হত হকেট (Hoquet) ফরাসী ভাষায় হকেট কথার অর্থ পাচন-বাড়ি। অর্থাৎ রাখালের লাঠি। অনেকের মতে হকেট থেকেই খেলার নাম হয়েছে হকি। এবং সেটা আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে, গ্রেট ব্রিটেনে খেলাটি চালু হবার পর।

আঠারো শতকের শুরু থেকে ইংলণ্ডের কোন কোন ক্লাব হকি খেলতে শুরু করে। কিন্তু বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না। খেলার প্রথা প্রকরনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। ১১ জনকে নিয়েই দল গড়া হত। কিন্তু ৮ জন খেলত ফরোয়ার্ডে। একজন গোলে ২ জন হাফ ব্যাকে। প্রতি-নিয়ত কায়িক সংঘর্ষ হত। স্টিকে জোরে জোরে বল মারো, আর দৌড়াও—এই ছিল খেলার বৈশিষ্ট্য।

একটা বাঁধাধরা আইনকানুন রচনায়

যে ক্লাবের প্রথম অবদান সে ক্লাবটির নাম ব্ল্যাকহিথ ক্লাব। ওটি ছিল ইংলন্ডে হকি, ফুটবল ও রাগবী খেলার মিশ্র ক্লাব। ক্লাবটির সৃষ্টি ১৮৪০ সনে। হকি খেলা বেশ একটু জনপ্রিয় হবার পর শুধু হকির জন্য পৃথক বিভাগ হল এবং তৈরি হল নিয়মকানুন। নিয়ম হল—দুই গোল-পোস্টের মধ্যে ব্যবধান থাকবে ১০ গজ (এখন ৪ গজ)। এক গোল থেকে অপর গোলের দূরত্ব হবে ২০০ গজ (এখন ১০০ গজ)। কোন খেলোয়াড় বল ছাড়া গোলের ৪০ গজের মধ্যে থাকতে পারবে না। মাঠের যে কোন জায়গা থেকে হিট করে গোল করা যাবে (এখন গোল পোস্টকে কেন্দ্র করে ১৬ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা অর্ধবৃত্তের মধ্য থেকে বল হিট না করলে গোল হয় না)।

মাঝে মাঝে আইনকানুনের কিছু পরিবর্তন হলেও এবং ১৮৮৩ সনে লণ্ডনের উইম্বলডন হকি ক্লাব নিয়ম-কানুনের অনেক কিছু সংশোধন করলেও সাংগঠনিক পরিবেশে আধুনিক হকির জন্ম ১৮৮৬ সনের ১৮ জানুয়ারি তারিখে। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড তখন ইংলন্ডের যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস। ওইদিন তিনি ব্রিটিশ হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ইংলন্ডের একশোটির বেশি ক্লাব হয় ওই অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত। তারপর ইংলন্ডের প্রচেষ্টায় হকি খেলা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যই সামগ্রিকভাবে অনাদিকালের স্রোত বেয়ে।

একটা মজার ব্যাপার যে ১৮৮৬ সনকে আধুনিক কালের হকির জন্ম সন বলা হয়েছে। তার এক বছর আগেই কিন্তু কলকাতায় হকি খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্যালকাটা ক্লাবের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এবং ভারতীয় হকি ফেডারেশনের মধ্যে বয়সের পার্থক্যও মাত্র এক বছর। বিশ্ব সংস্থা বয়সে এক বছরের বড়। সৃষ্টি ১৯২৪ সনে। ভারতীয় সংস্থা গঠিত হয় পরের বছর। ভারতের প্রথম প্রাদেশিক হকি সংস্থা কোনটি? গর্ব করে বলার মত নাম —বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন। গঠিত হয়েছে ১৯০৮ সালে। এবং গর্ব করে বলা যেতে পারে, এখন কলকাতার যে বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা চলছে এটি পৃথিবীর প্রাচীন হকি প্রতিযোগিতার অন্যতম। ১৮৯৫ সনে শুরু। অবশ্য বোম্বাইয়ে আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার খেলাও শুরু হয় ১৮৯৬ থেকে। এখন আকর্ষণ কমে গেলেও আগে এ দুটি প্রতিযোগিতার দারুন জলুষ ছিল। যেমন ছিল খেলার মধ্যেও জলুষ ও চমক।

নমনীয় কব্জির সূক্ষ্ম মাপা মোচড়ে দক্ষ ও পটু ছিল ভারতীয়দের হাত। সূক্ষ্ম কাজে ভারতীয়দের হাত ও মাথা খোলার খ্যাতি আছে। যে হাতে তাঁতিরা ঢাকাই মসলিন তৈরি করেছে, কাশ্মীরীরা করেছে শাল, মেয়েরা নকসী-কাঁথা। যে হাতে কোনারক, খাজুরাহো, ও অজন্তায় শিল্প ও ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়েছে সে হাত ভারতীয়দেরই। হকি খেলাতেও ভারতীয়রা ভেল্কি দেখাতে পারত, যদিও খেলা শিখেছিল ইংরেজদের কাছ থেকে।

১৯২৮ থেকে এ পর্যন্ত অলিম্পিকে ও বিশ্বকাপে ভারতীয় হকি দলের খেলার ফল, গোল ও স্থানের একটা চার্ট এই সঙ্গে দেওয়া হল। ওই চার্ট থেকেই দেখা যাবে ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে ভারত কিভাবে হকি-দুনিয়ার শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল।

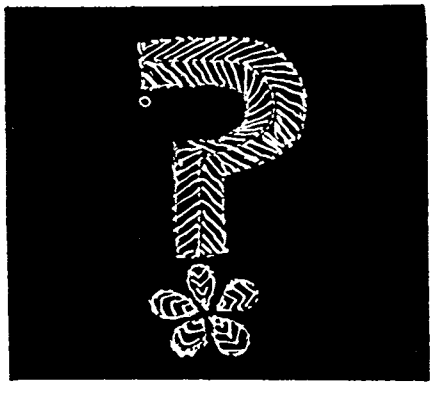

সাদাটা না কালোটা

বহুদিন বাদে দুই বন্ধুর দেখা—দুজনেই বিখ্যাত শিকারী। আজকাল বাঘ মারা বারণ তাই অন্য দেশে নানা জন্তু জানোয়ার মেরে বেড়ান—এমন সব জন্তু যা লোপ পাবার বদলে বরং বংশ-বৃদ্ধি করে মানুষের ঝামেলা বাড়াচ্ছে। বীরেন্দ্র বিক্রম সিংহ রায়ের বাড়ি। দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে দুটি সদ্য মারা ভালুকের চামড়া। একটি সাদা, অন্যটি কালো। বন্ধু রুদ্রপ্রসাদ বর্মণ চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলেন ;

রুদ্রপ্রসাদঃ তারপর? ভোরবেলা ক্যাম্প ছেড়ে তো বেরোলি—

বীরেন্দ্রবিক্রমঃ হ্যাঁ তারপর গেলাম সোজা দক্ষিণ—তিন কিলোমিটার —সেখানে দেখা পেলাম ঐ মক্কেলের (দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখালেন, কিন্তু কোনটার দিকে বোঝা গেল না)—তা বাছাধনকে কাবু করতে একটি গুলিই যথেষ্ট। ভাবলাম থাক ওখানে পড়ে—এ তো জনমানবহীন জায়গা, আপাততঃ আর একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক।

রুদ্রপ্রসাদ ঃ ভালুক ঐখানে পড়ে রইল? কোনটা—সাদাটা না কালোটা?

বীরেন্দ্রবিক্রম ঃ বলছি, এবার গেলাম সোজা পুবে—পাক্কা পাঁচ কিলো-মিটার—কিন্তু হরি হরি, একটু পরেই বুঝতে পারলাম ক্যাম্প থেকে আমার দূরত্ব কিন্তু সেই তিন কিলোমিটারই আছে।

রুদ্রপ্রসাদ ঃ কি করে বুঝলি?

এই সময় ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠতেই গল্পে বাধা পড়ল। একটু পরে রুদ্রপ্রসাদ নিজের মনেই বললেন ও বুঝেছি।

উনি কি বুঝেছিলেন?

উত্তরঃ ওটা সাদা ভালুক। কারণ বীরেন্দ্র বিক্রমের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর ক্যাম্প উত্তর মেরু ছাড়া আর কোথাও হতেই পারে না। উত্তর মেরুতে দক্ষিণ ছাড়া আর কোনো দিক নেই। তাই তিনি যত পুবেই যাচ্ছেন মনে করুন না কেন আসলে তিনি সমস্তক্ষণই ছিলেন ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সংকলিত

মণিমেলার খবর

বাংলা ১৩৪৭ সাল। ইংরাজী ১৯৪০ সাল। বাংলা দৈনিক আনন্দবাজারের পাতায় দেখা দিল ছোটদের নিজস্ব পাতা 'আনন্দমেলা'। ভারতীয় ভাষায় সেই প্রথম। 'মৌমাছি' ছদ্মনামের আড়াল এই পাতার পরিচালক সমস্ত শিশু ও কিশোরদের নিজ নিজ পল্লীতে 'মণিমেলা' গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। গড়ে উঠল অসংখ্য মণিমেলা ভারতের নানান প্রান্তে।

এ দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দময় ও আদর্শ জীবনের উপযুক্ত আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে যাতে তারা প্রত্যেকেই সবল, কর্মঠ ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, তারই জন্য মণিমেলার সৃষ্টি।

মণিমেলা এ দেশের সকল অঞ্চলের, প্রদেশের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন মণিমেলায় মিলিত করে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বে পরস্পরকে বেঁধে দিয়েছে। মণিমেলা ছোটদের গুছিয়ে ভাববার, সহজ সুন্দর করে মনের কথা বলবার, আচার-আচরণে সত্যনিষ্ঠ, ধীর নম্র হওয়ার শিক্ষাই দেয়। মণিমেলা আজ শিশু ও কিশোর সমাজের এক পরম বন্ধুর ভূমিকা নিয়েছে।

কোনও পল্লীতে মণিমেলা গড়তে হলে মণিমেলার সভ্য হতে ইচ্ছুক ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকেরা একটি সভায় মিলিত হয়ে মণিমেলা গঠন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে উপস্থিত সকলের স্বাক্ষরযুক্ত সেই প্রস্তাবটি মণি-মেলায় যোগাযোগ করতে হবে। অন্তত ২০ জন ভাইবোনের নাম, ঠিকানা, বয়স ইত্যাদি সহ একটি তালিকা মণিমেলা গঠনের অনুমতি প্রার্থনা করে কেন্দ্রমণি, মণিমেলা মহাকেন্দ্র, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২, রুম-৫, কলকাতা-৭০০০২৯ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার ও রবিবার ছাড়া যে কোনও দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ওপরের ঠিকানায় সাক্ষাৎ করা যায়। ৪৬-৯৮১০ নম্বরে টেলিফোনেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মণিমেলার উৎসব

মণিমেলা পতাকা দিবস উদ্‌যাপিত হল ১০ মার্চ। একটি সুন্দর ইচ্ছা। একটি মহৎ পরিকল্পনা। একটি সার্থক রূপায়ণ। উদ্দেশ্য ছিল—জনসংযোগ, সাংগঠনিক প্রচার ও অর্থসংগ্রহ। সেদিন সকাল থেকেই মণিমেলার পোষাকে সজ্জিত হয়ে, কর্মীদের যোগ্য তত্ত্বাবধানে, হাসিখুসী প্রাণচঞ্চল ভাই-বোনেরা স্নিগ্ধ মাধুর্যে এগিয়ে গেছে কত মানুষের কাছে, বিচিত্র ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছে মণিমেলার উদ্দেশ্য, পরিয়ে দিয়েছে পতাকা, হাতে দিয়েছে সুন্দর, ছোট্ট প্রচার পুস্তিকা। মুগ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের স্নেহ জানিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, সেদিন নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে মণিমেলার স্থান মানুষের মনের কত গভীরে, সেই আবিষ্কারের আনন্দে ঘরে-ফেরা ক্লান্ত ভাইবোনের মনে কি এক গভীর উচ্ছ্বাস। সকলেই কাছে ডেকে ভালবেসে মণিমেলার প্রশংসায় মুখর হয়েছে। এখনও মণিভাইবোনেরা তাই ভুলতে পারছে না কয়েকটি স্মৃতি। মনে পড়ছে সেই ক্লান্ত শ্রমিকের কথা—যে শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতে ওদের ডেকে ছোট্ট একটি মুদ্রা দান করেছে সানন্দে আর ওরা তার কোল ঘেঁসে পরিয়ে দিয়েছে মণিমেলার পতাকা-ব্যাজ। কি এক শান্তিতে খুশী হয়েছে সেই ক্লান্ত মুখ। সংগৃহীত সমস্ত অর্থই ব্যয় করা হবে শিশু কল্যাণের কাজে।

মণিমেলার সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২ মার্চ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে, সারা বছর ধরে কেন্দ্রীয়ভাবে ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে মণিমেলা মহাকেন্দ্র নানান ধরনের যে সব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন, তার প্রায় পাঁচশো পুরস্কার বিতরণ করা হয় এদিন। এর আগে প্রায় দু হাজার মণিভাইবোনের এক বিরাট শরীর ক্রীড়া অভিপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মাঙ্গলিক সানাইয়ের মধুর তান মিলিয়ে যেতেই শুরু হল মার্চ পাস্ট, তারপর সারা মাঠজুড়ে সমবেত ব্যায়াম। শরীর চর্চার ক্ষেত্রে মণিমেলা নিজেদের নৈপুণ্য আবার প্রমাণ করল। অভাবনীয় এই সমাবেশে ভাইবোনেরা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নিখুঁত শিক্ষাপদ্ধতির যে নিদর্শন তুলে ধরল তা মণিমেলার ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ময়দানে রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে মণি-মেলা মহাকেন্দ্র আয়োজিত ছোটদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শহরের নানান প্রান্ত থেকে আগত অগণিত ক্ষুদে শিল্পীর দল অনেক সবুজ ক্যানভাসে নিজেরাই এক অনবদ্য চিত্র-কল্পের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী চণ্ডী লাহিড়ী, অশোক চৌধুরী ও সমীর মণ্ডল। শিল্পীদের বেশ কয়েকটি কাজ অত্যন্ত উচ্চমানের বলে বিচারকেরা মন্তব্য করেন। এদিনের প্রতিযোগিতার ফলাফল হল:

'ক' বিভাগ

ছবি আঁকা—১ম—ঋতুপর্ণা বসু; ২য়—কল্লোল ঘোষ; ৩য়—ক্রিস্টিনা নির্মলা সুন্দরম্; **বিশেষ পুরস্কার**—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

'গ' বিভাগ

ছবি আঁকা—১ম—নৃসিংহ বিশ্বাস; ২য়—বৈদ্যনাথ পাল; ৩য়—প্রদ্যোৎ নাগ। আলপনা—১ম—এম নীলা সুন্দরম; ২য়—গোপাল নাথ; ৩য়—উজ্জ্বল বিশ্বাস।

'খ' বিভাগ

ছবি আঁকা—১ম—স্বপন দাস; ২য়—লীলা বিশ্বনাথ; ৩য়—অনুশ্রী ভট্টাচার্য। **আলপনা**—১ম—অনুশ্রী ভট্টাচার্য; ২য়—অসীম দাস; ৩য়—নূপুর চাকলাদার।

'ঘ' বিভাগ

ছবি আঁকা—১ম—স্বপন দাস; ২য়—তরুণ চক্রবর্তী। **আলপনা**—১ম—স্বপন দাস।

প্রায় চারশত শিক্ষার্থী নিয়ে গত ২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের ইতিহাসে বৃহত্তম শিক্ষণ শিবির বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবলস্ হাই স্কুলে। মণি-ভাইবোন ও কর্মী ভাইবোনদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষণসূচী ছাড়াও এবারে ছিল বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শরীর শিক্ষা ও কর্ম শিক্ষার দুটি আলাদা শিক্ষাক্রম।

সুন্দরী

লীলা মজুমদার

গুঁপি ভালো করে পথ বাৎলে দেয়নি। বেলা দশটায় পানু যখন ছোট্ট স্টেশনটাতে নামল, কোন্ দিক দিয়ে যাবে ভেবে পেল না। বড় একটা শিমুল গাছতলায় পুরনো এক গাছের গুঁড়িতে বসে দু'-জন লোক চা খাচ্ছিল। পানু তাদের গুঁপির দাদুর নাম বলতেই বুড়ো লোকটা—স্টেশন মাস্টার হয়তো—দু' হাতে গরম চায়ের ভাঁড় ধরে, চোখের তারা ঘুরিয়ে ডান দিকে দেখিয়ে বলল, "ওর সঙ্গে যাও। ও ঐদিকেই যাবে।"

সেদিকে তাকিয়ে পানুর চক্ষু স্থির। এই বড় একটা সবুজ রঙের ড্র্যাগন-ফ্লাই, দু-জোড়া পাতলা ডানা মেলে, মাটি থেকে দেড় মানুষ উঁচুতে একেবারে স্থির হয়ে আছে। তা হলে এর-ই সঙ্গে যেতে হবে। এ তো এদিকে নড়ে চড়ে না। আজ পানু প্রথম লক্ষ্য করল ড্র্যাগন-ফ্লাইটার কাচের মতো পাতলা ডানায় মিহি জালি কাটা রয়েছে। সকালের রোদে মাটির ওপরে ড্র্যাগন-ফ্লাইয়ের ছায়া পড়েছে, তাতে অবধি জালি দেখা যাচ্ছে। ওর গায়ে রোদ পড়ে সবুজ রঙের ছটা বেরুচ্ছে।

এর-ই সঙ্গে যেতে হবে তাহলে। কখন যাবে কে জানে। হঠাৎ ড্র্যাগন-ফ্লাই এক ঝলক আলোর মতো সেখান থেকে কুড়ি হাত দূরে সরে, আবার শূন্যে স্থির হয়ে ভেসে রইল। পানুও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে পৌঁছল। মনে হল ড্র্যাগন-ফ্লাই কিছু চিবুচ্ছে। আশ্চর্যের কথা যে, এতদূর সরে এল, অথচ এতটুকু ডানা নাড়া দেখা গেল না।

চিপ্-চিপ্ শব্দ করতে করতে একটা বুল-বুলি পাখি কোথা থেকে ছোঁ মারল। ধরতে পারলেই হয়েছিল আর কি! পথ-প্রদর্শকের দফা গয়া হলেই তো পানুরও হয়ে গেছিল! কিন্তু পারেনি ধরতে। ড্র্যাগন-ফ্লাই শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। অদৃশ্য হবে আবার কি! এ কি পরী নাকি? ভালো করে চেয়ে দেখে পানু বুনো রঙ্গন গাছের পাতা থেকে এক আঙুল ওপরে রয়েছে ড্র্যাগন-ফ্লাই আর দু হাতে এক বেচারা পাঁচ-কামড়াকে ধরে, তাকে বিস্কুটের মতো কামড়ে খাচ্ছে। নাকি এর সঙ্গেই যেতে হবে। এর তো যাবার বিশেষ তাড়া দেখা যাচ্ছে না।

চোখ দুটো বেজায় বড়। মনে হল দুটো চোখ নয়, মাছির মতো দু গোছা চোখ। রোদ লেগে সমুদ্রের মতো নীল দেখাচ্ছিল। কি সরু কোমরটা, ছিঁড়েটিঁড়ে যাবে না তো? লম্বা সবুজ গাটাতে মিহি দাগ কাটা। পানুর মনে হল পরী না হলেও পরীর চেয়ে কিছু কম যায় না।

এক ঝলক বিদ্যুতের মতো বনের মধ্যে ঢুকে গেল ড্র্যাগন-ফ্লাই। কাঁটার খোঁচা লেগে ডানাতে ছ্যাঁদা হয়ে গেলেই তো হয়ে গেল পানুর আজ গুঁপির দাদুর বাড়ি যাওয়া। ভালো পথ-প্রদর্শক দিয়েছে ঐ লোকটি।—বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল পানুর।

সামনে প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল! তাতে একটা বেশ বড় হলদে প্রজাপতিও ঝুলছে। হয়তো এখনো মরেনি, একটু একটু নড়ছে মনে হল। জালের পাশে গাছের ডালের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে একটা সুপুরির মতো বড় মাকড়সা প্রজাপতির দিকে চেয়ে আছে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। ভাগ্যিস ড্র্যাগন-ফ্লাইটাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ড্র্যাগন-ফ্লাই-ও কি ওকে দেখতে পায়নি?

চিড়িক্ করে সরে ড্র্যাগন-ফ্লাই মাকড়সার মাথার ওপর এসে শূন্যে ভাসতে লাগল। পানুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ড্র্যাগন-ফ্লাই প্রায় মাকড়সার পিঠে নামল। তারপর কুট কুট করে দেখতে দেখতে মাকড়সার আটটা ঠ্যাং একে একে কেটে ফেলে দিয়ে, ঢোলের মতো শরীরটাকে মুখে নিয়ে শোঁ করে বনের আরো অনেক ভিতরে ঢুক পড়ল। অগত্যা পানুও বনের মধ্যে ঢুকল।

অমনি সূর্যের আলোর রঙ বদলে সবুজ হয়ে গেল। রোদেতে ছায়াতে সোনালীতে সবুজে

মিলে ড্র্যাগন-ফ্লাই প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বনের মধ্যে থেকে কত রকম শব্দ উঠতে লাগল। কটর-কটর! গুপি বলে ওটা ব্যাঙের ডাক। বাস্তবিকই তাই। সামনে একটা টলটলে জলে ভরা পুকুর। তাতে গাছের ছায়া পড়েছে। সেই জলের ওপর নিশ্চল হয়ে ভেসে আছে ড্র্যাগন-ফ্লাই। মাকড়সা খাওয়া সারা হয়ে গেছে মনে হল। জলের ধারে তেঁতুল- গাছের গোড়ায় একটা ব্যাঙ সতৃষ্ণ নয়নে ড্র্যাগন-ফ্লাইয়ের দিকে চেয়ে আছে। ভালো করে

চেয়ে দেখল পানু; একেবারে নিশ্চল হয়ে নেই ড্র্যাগন-ফ্লাই, জলের ওপর ছোট্ট ছোট্ট মশার মতো যে-সব পোকা উড়ছিল, কাচের মতো পাতলা ডানা আর পান্নার মতো সুন্দর সবুজ গা রোদে মেলে দিয়ে, খুদে খুদে পোকাগুলোকে ধরে মশলার মতো চিবিয়ে খাচ্ছে!

তাই দেখে ধপ্ করে বসে পড়ল পানু। শুকনো পাতার মতো দেখতে একটা লোক ঐ পুকুরে মাছ ধরছিল, পানু এতক্ষণ দেখতে পায়নি। সে এবার একটু মুচকি হেসে বলল, "শুধু তাই নয়। শুন্যে বাস করে, ডাঙ্গার জিনিস ধরে খায়, জলের গাছে ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চারা জলের মধ্যিকার সব পোকা মাকড় কুচো চিংড়ির ছানা, মায় আমার ছিপে বাঁধা টোপটা সুদ্ধু খাবার তালে থাকে। ঐ বুঝি তোমাকে নিতে এসেছে।"

শুনে আঁৎকে উঠেছিল পানু। ফিরে দেখে ড্র্যাগন-ফ্লাই নয়, গুপিদের চাকর গুটে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

ড্র্যাগন-ফ্লাইটা বোধ হয় জলের বড় বেশি কাছে নেমে এসেছিল। সড়াৎ করে ব্যাঙের জিব বেরিয়ে এল; তারপরেই হতভম্ব পানু দেখল ড্র্যাগন-ফ্লাইয়ের মাথাটা ব্যাঙের মুখের এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে, সবুজ রঙের ল্যাজের ডগাটা অন্য পাশ দিয়ে ঝুলছে। তারপর তাও দেখা গেল না। পানু বলল, "স্টেশন-মাস্টার তো আচ্ছা লোকের সঙ্গে যেতে বলেছে আমাকে!"

গুটে বলল, "তা বললে হবে কেন? তেনা বলেছিল আমার সঙ্গে যেতে, তা তুমি তো বোঁ করে কোথায় পেলিয়ে গেলে! সেই ইস্তক খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

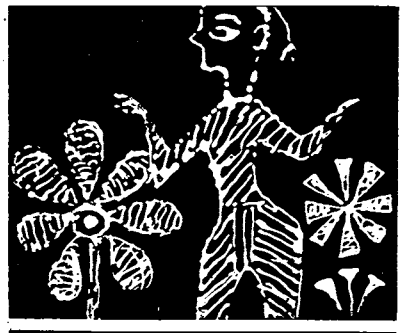

ধাঁধা

মুখে-মুখে ছড়া বানাতে, আর ছড়া বানিয়ে বোকা বানাতে ওস্তাদ আমার এক ছোট্কা। সেদিন সকালে ছোট্কা ঘরে বসে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল শব্দকোষের পাতা ওলটাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে সবে বলেছি, 'একটা ছড়া বল না ছোট্কা।' অমনি ধাঁ করে কি বলল জান? বলল,

দ্বন্দ্ব থেকে কি করে হয় ধাঁধা,
চট করে তুই বলতে পারিস হাঁদা?

শুনে তো আমি থ। শুধু থ কেন, একেবারে দ ধ ন। ছুটে পালিয়ে আসছি, ছোট্কা পেছন থেকে আবার সুর করে ডাকল,

কোন্ শিশুটির বুকে জল?
সহ্য না হয় কোন্ কল?

আর আমাকে পায় কে! ছোট্কা যে কাল বিকেলেই ছড়া দুটো লিখে রেখেছে। উত্তরও পাশে দেওয়া ছিল। আমি তো লুকিয়ে দেখেছি। এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম, চৌবাচ্চা, ধকল। ছোট্কা এবারে থ। গালটা টিপে ধরে বলল,

জল নেই তবু বলি খাল?
কোন্ সিম খেয়ে নাজেহাল?

এ আবার কখন বানাল ছোট্কা। উত্তর বলি কি করে? খাল দিয়ে কি শব্দ হয়? ভাবতে ভাবতে যখন হিমসিম হয়ে গেছি, তখনই...ঠিক তখনই বললাম, হিমসিম।

আর আগেরটা? ছোটকা যে বেশ অবাক হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। একটু আদর করে বলল, 'মাঠে গিয়ে খোঁজ, পাবি।'

সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরেও পেলাম না। দুপুরে বাড়ি ফিরে খেলাম খাবার আর বকুনি। খেয়ে উঠে ছোট্কার ঘরে গিয়ে দেখি ছোট্কা ঘুমুচ্ছে। পাশেই খাতাটা তাতে কালকের সেই ধাঁধা। তার নিচে দু লাইন ছড়াঃ

দ্বন্দ্ব ছিল, ধন্ধ হল, ধন্ধ থেকে ধাঁধা,
উপাধ্যায়ের কাছে যেমন ওঝার টিকি বাঁধা।

কিন্তু সেই ধাঁধাটার উত্তর কই? ও বাবা, তার বদলে আরও চার লাইন ঃ

কোন ফুল ওল্টালে পাখি
চট করে বলা যায় তা কি?
উত্তরে না পাও না পাবে
সমাধান রয়েছে জবাবে।

ছোট্কা দেখছি আমার চালাকি ধরে ফেলেছে। উত্তর আর লিখছে না। ছোট্কার খাতা থেকে চুরি করে আরও দু-একটা অন্যরকম ধাঁধা তোমাদের কাছে দিচ্ছি। তোমরা দেখতো উত্তর করতে পারো কিনা। না পারলে, আমি কথা দিচ্ছি, উত্তরটা ঠিক ম্যানেজ করে জেনে দেব। এগুলোর নাম দেখছি লেখা রয়েছেঃ বড়দের ধাঁধা। তা হোক, আমরা তো বড়োই। কি বল?

প্রথম ধাঁধা ঃ সদানন্দবাবু, সদাশিববাবু ও শিবানন্দবাবু—এই তিনজনের একজন অধ্যাপক, একজন উকিল এবং একজন ডাক্তার। কে কোন্‌টি তা কিন্তু বলছি না।

সদানন্দবাবু ও শিবানন্দবাবু প্রতি রবিবার একসঙ্গে তাস খেলেন।

শিবানন্দবাবু সদাশিববাবুর পরিচিত।

পুরনো টাকা জমান অধ্যাপকটি, হাতে-আঁকা ছবি কেনার নেশা উকিলের, ডাক্তারবাবুর বাতিক স্ট্যাম্প জোগাড় করা।

উকিল এবং ডাক্তার একে অন্যকে দেখেননি।

সদাশিববাবু পিকাসোর নাম শোনেন নি।

বল তো, কার কি জীবিকা?

দ্বিতীয় ধাঁধা ঃ জাহাজডুবির পর এক জনমানবশূন্য দ্বীপে সাঁতার কেটে পৌঁছল এক ডাক্তার এবং নার্স। সেই দ্বীপে এরা ছাড়া অন্য কোনো জীবিত প্রাণী ছিল না। ডাক্তার ও নার্স বিয়ে করে ওই দ্বীপেই সংসার পাতল। এক বছর পর একটি ফুটফুটে ছেলে হল। কিন্তু ডাক্তারটি ছেলেটির বাবা নয়, নার্সও তার মা নয়।

তবে ছেলেটির বাবা ও মা কে?

সত্যসন্ধ

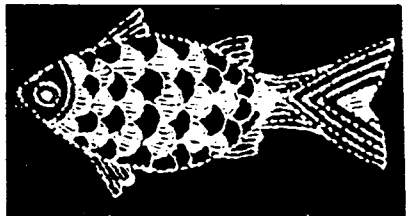

জানা না-জানা

স্যাণ্ডউইচ এল কোথা থেকে?

ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ, চীজ স্যান্ডউইচ, চিকেন স্যান্ডউইচ—কতরকম স্যান্ডউইচের কথা তোমরা শুনেছ। হয়তো খেয়েও থাকবে। দু' চাকলা পাঁউরুটির ভেতর টম্যাটো আর শশা কেটে বাড়িতেও স্যান্ডউইচ বানানো যায়। কিন্তু এই স্যান্ডউইচ খাদ্যটি হল কি করে? তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে চতুর্থ আর্ল ছিলেন স্যান্ডউইচ। তাঁর নামানুসারে খাবারটির নাম হয় স্যান্ডউইচ। স্যান্ডউইচ ছিলেন অভিজাত বংশের লোক। বিখ্যাত টমাস কুক তাঁর নামেই দ্বীপের নাম করেছিলেন স্যান্ডউইচ দ্বীপ। সেগুলি এখন হাওয়াই দ্বীপের মধ্যে পড়ে। তিনি রাজার এবং আর্লের খুব প্রিয় ছিলেন। স্যান্ডউইচের ছিল দুর্দান্ত তাসের নেশা। একবার তাস খেলায় বসলে তিনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন। খাওয়ার জন্যেও দু' দণ্ড হাতের তাস নামাতেন না। সঙ্গে তাঁর একজন লোক থাকত। দু' চাকলা রুটির ভেতর মাংস পুরে সে তাঁকে খেতে দিত। স্যান্ডউইচ খেলতে খেলতে খেতেন। তবু টেবিল ছেড়ে উঠতেন না। সেই থেকে স্যান্ডউইচ নাম হল খাবারের। কিন্তু দু' টুকরো রুটির ভেতর মাংস পুরে খাওয়ার চল বহুকালের। আর্ল স্যান্ডউইচের জন্মাবার অন্তত আঠারো শ' বছর আগে রোমানরা ইংরেজদের এই খাওয়া শিখিয়েছিল। তার অবশ্য অন্য নাম ছিল। বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্স সর্বপ্রথম মানুষকে স্যান্ডউইচ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। বুকে, পিঠে বিজ্ঞাপন এঁটে যে-মানুষ ঘুরে বেড়ায় তাকেই তিনি বলেছেন স্যান্ডউইচ মানুষ।

সত্যজিৎ রায়ের
ছোটোদের বই

বাদশাহী আংটি ৫·০০

এক ডজন গপ্পো ৮·০০

প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০

গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০

কৈলাসে কেলেঙ্কারী ৫·০০

বাক্স-রহস্য ৫·০০

সাবাশ প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০

সোনার কেল্লা ৬·০০

রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা-৯

ANANDAMELA 16 APRIL 1975
দেড় টাকা

আনন্দমেলা